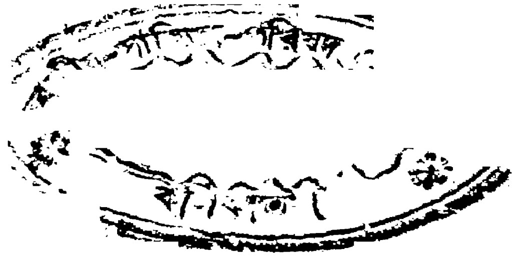




সম্রাট ঔরঙ্গজেব

(জীবনী)

শ্রীপাঁচকড়ি রায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৫

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব।

প্রথম লহরী

সিংহাসন-বিদ্রোহে।

শান্তিপ্রিয় সম্রাট্ শাজাহান যখন লোকললামভূতা সৌন্দর্য্যের রাণী মমতাজের প্রেমস্মৃতি, উদ্দীপ্ত করিয়া আগরাব অনুপম সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত তাজ-মহলে সেই দীপ্ত প্রভা চিববিবস্বান্ রাখিয়া, প্রেম-মাহাত্ম্যের সমুজ্জ্বল লীলা প্রেম-লোলুপ জগদ্বাসীব চক্ষে মূর্ত্তিমান্‌ভাবে প্রকটিত করিয়া, আত্মগৌরবে-পরি-স্ফীত হইতেছিলেন , মনে করিতেছিলেন, কালেব কঠোর নির্দ্দেশে ভুবন বিমোহিনী প্রিয়তমাকে হারাইয়াছি বটে, সে প্রেমের লহর-লীলায় আনন্দ প্লাবনের তুমুল উল্লাস এ জীবনে আব স্পন্দিত হইবে না বটে, কিন্তু আমাব কালজয়ী তাজ, সে প্রেমেব চিবদেদীপ্যমান প্রভা অতুলনীয় মরকত-মণির কারুকার্য্যে চির-বিবস্থিত কবিযা যুগযুগান্ত ধবিয়া প্রেমিক-প্রেমিকার সোৎসুক চক্ষে শারদীয় চন্দ্রমার রজতশুভ্র অমিযধারাবৎ প্রেম-কিরণমালা উল্লাসে উল্লাসে ঢালিয়া দিবে , এ প্রেম-স্মৃতির প্রীতি-দীপ্তিতে সকলেরই প্রাণে পবিত্র ভালবাসা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিবে। ভাবিতেছিলেন, আমি যে ভারত-সম্রাট্ শাহানশা শাজাহান আমিও বিশ্বজয়ী প্রেমের ভক্তিমান উপাসক ,— মমতাজের প্রেমের পূত প্রভাবে পড়িয়া, বিরহের আগুনে ধূপের মত পুড়িয়া পুড়িয়া, নিজ হৃদয়ের প্রেমমাধুর্য্য সম্ভার দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আমার প্রেম স্মৃতির পুণ্যময় মন্দির তাজমহল-দর্শকের চিরদিন উপলব্ধি হইবে।

সৌন্দর্য্য-ধ্যানমগ্ন সম্রাট্ শাজাহান যখন প্রেম-সৌরভে বিভোর হইয়া স্বপ্নরাজ্যের স্মৃতি-মন্দির বাস্তবজগতে লোকলোচন-গোচরে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন,আর মুমূর্ষুতা যখন অজ্ঞাতে অনায়াসে ধীরে ধীরে তাঁহার পরিণত

শরীরে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার শত নরপতি-শিরস্ত্রাণ-লুণ্ঠিত ময়ূর-সিংহাসন অধিকারের জন্য চারিটি লোলুপ-দৃষ্টি সোৎসুকভাবে চাহিয়া ছিল, সে সকল দৃষ্টি ব্যাঘ্র-দৃষ্টির মত ক্ষুধার্ত্ত রক্তপিপাসু—সিংহ-দৃষ্টির মত বল, বিক্রম, উৎসাহশালী—সর্পদৃষ্টির মত ক্রূর কূট রাজনৈতিকত্ব-পূর্ণ—বজ্রাগ্নির মত অগ্নিস্রাবী ও বিপর্য্যয়কারী, এই লুব্ধ নেত্র-নিচয় আর কাহারও নহে; ময়ূর-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী পরস্পর বিরোধী ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের—শাহান্‌শা সম্রাট্ শাজাহানের চারি পুত্রের।

সিংহাসন আশে পিতৃ-বিদ্রোহ মোগল-সাম্রাজ্যে নূতন নহে। সাম্যনীতির চিরভক্ত সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধে নূরজাহান-রূপ-মুগ্ধ সেলিম তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন; বিশ্ববিমোহিনী রমণীকটাক্ষচালিত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য নব-যৌবনে বিপুল-বিক্রমে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন শাজাহান; এক্ষণে সেই শাজাহানের বার্দ্ধক্য-শিথিল বিকম্পিত মুষ্টি হইতে মোগল-সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড সবলে ছিনাইয়া লইবার জন্য চারি পুত্র চারিদিক্ হইতে সবেগে প্রধাবিত হইলেন; বিচঞ্চলা রাজলক্ষ্মী বহুদিন বীর তরবারির তীক্ষ্ণধারে প্রতিদ্বন্দ্বী-চতুষ্টয়ের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া অবশেষে বীরত্বে ও রাজনীতিজ্ঞতাতে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের পক্ষসমর্থন করিলেন।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব্বপ্রথমে রাজকুমার-চতুষ্টয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রজাহিতৈষী সম্রাট্ শাজাহান নিজ বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট অসমর্থ শরীরে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বুঝিয়া, কাবুল শাসনভারপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ দারাকে পার্শ্বাসন প্রদান করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালন করাইতেছিলেন, অমাত্যগণ ও প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে ভাবী সম্রাট্ জানিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিত। দারায় প্রভূত পরিমাণে প্রজারঞ্জন ও হৃদয় আকর্ষণের শক্তি ছিল। সম্রাট্ শাজাহানের প্রাণগত ইচ্ছা ছিল, তিনি নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারাই তাঁহার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী; কিন্তু অপরাপর ভ্রাতাও সাম্রাজ্যের আশা বিসর্জ্জন করেন নাই, তাহারাও সে আশা-লতিকাকে প্রস্ফুনিত করিবার জন্য সযত্নে আয়াস-বারি সেচন করিতেছিলেন।

চারি ভ্রাতাই তলে তলে ওমরাহ ও সেনাপতিগণকে স্বদলভুক্ত করিয়া ষড়যন্ত্র চালাইতেছিলেন; সম্রাটের নিভৃত অন্তঃপুরেও এ ষড়যন্ত্র প্রহেলিকার অভাব ছিল না। সম্রাটের দুহিতাদ্বয়, জ্যেষ্ঠা বিদুষী সুন্দরী জাহানারা দারার

পক্ষে ও কনিষ্ঠা রোসেনা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে অন্তঃপুর-ষড়যন্ত্র প্রধূমিত করিতে ছিলেন, ইহাঁরা বিপত্নীক শাজাহানের সেবাচ্ছলে ভ্রাতৃদ্বয়ের অভীষ্ট সাধনে স্বতঃপরতঃ যত্নবতী ছিলেন। সম্রাট্ শাজাহান নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উর্বর-ক্ষেত্রে ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষময় বীজ বপন করেন। মোগলরাজ্যে জ্যেষ্ঠা-ধিকার প্রথা ছিল না। একের উপর স্নেহ-প্রবণতা ও প্রভুত্ব-প্রদান অপর ভ্রাতা সহ্য করিতে পারিবে কেন? কিন্তু স্নেহশীল পাতশাহ কোন রাজ-কুমারকেই উপেক্ষা করেন নাই। রাজকুমারগণের ভ্রাতৃ-দ্বেষ উপলব্ধি করিয়া এবং তাহাদের সংঘর্ষে অচিরেই সিংহাসনের পাদমূল বিকম্পিত হইবে, এমন কি, অচিরে মোগল-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবারও সম্ভাবনা দাঁড়াইবে কল্পনা করিয়া, শৌর্য্যবীর্য্যশালী কার্য্যদক্ষ রাজকুমারগণকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যভারে সমাচ্ছন্ন হইলেই কুমারগণের এ বিদ্বেষভাব অপসারিত হইবে। আবার সৌভ্রাতৃপ্রেম জাগিয়া উঠিবে, কিন্তু সে ভাব বহুদিন তৈমুর-বংশ হইতে তিরোহিত হইয়া ছিল। প্রজাহিতৈষী সম্রাট্ শাজাহান দ্বিতীয় পুত্র উচ্ছৃঙ্খল সুজাকে পাঁচ হাজারী মুনসফদার করিয়া বঙ্গদেশের শাসনভার প্রদান করেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বীরোচিত সাহসের পরিচয় পাইয়া তৃতীয় পুত্র কিশোরবয়স্ক ঔরঙ্গজেবকে সম্রাট্ অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহাকে তিনি দাক্ষিণাত্য-শাসন ও বিজয়ের ভার অর্পণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাজাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতিনিধি-রূপে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। দারা এতদূর ক্ষমতা-প্রিয় ছিলেন যে, শাজাহান নাম মাত্র সম্রাট্ এ কথাও তাঁহার অসহ্য, পিতাকে জন্মের মত অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া আপনি অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিবেন এরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন।

সম্রাটের পীড়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, একে প্রাচীন শরীর, তাহাতে প্রাণপ্রিয়তমা বেগমের শোক তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়াছিল। তাহার উপর পুত্রগণের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের অনির্দ্দিষ্ট পরিণাম, ভ্রাতৃদ্বেষের অশান্তি তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল। হঠাৎ একদিন রব উঠিল, সম্রাট্ শাজাহান মরজগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা নগরে

মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ তোরণদ্বার জনসঙ্ঘে পূর্ণ হইয়া গেল, রাজপথের দোকানপাট, কাছারী, দরবার বন্ধ হইল, সম্রাটের জন্য প্রজাপুঞ্জ কাঁদিতে লাগিল। আর্ত্তের সুহৃদ, প্রজাবৎসল, বিপন্নের বন্ধু, উদার-হৃদয়, সৌন্দর্য্যভক্ত, শান্তিপ্রিয় সম্রাট্ শাজাহান আর ইহ-জগতে নাই, দেশময় তুমুল রোলে হাহাকার উঠিল। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ ঝড়ের মত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শাজাহান প্রজাহিতৈষী সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার জন্য সাধারণ প্রজার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু এই গভীর শোকের দিনে পিতৃবিয়োগ-বেদনাকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দ উৎসাহে, বীরত্বে ও প্রতিহিংসায় ভারত-সিংহাসনে আধিপত্য লাভের জন্য চারি ভ্রাতা প্রবল যুদ্ধোদ্যমে ব্যাকুল হইয়া রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন।

জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। সম্রাট্ শাজাহান নিরাপদে জীবিত,ধীরে ধীরে নিরাময় হইয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিলেন। শাজাহান আরোগ্য হইলেন বটে, রাজপুত্রগণ যথাসময়ে সে সংবাদ অবগত হইলেন বটে, কিন্তু প্রধূমিত বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, ধূ ধূ করিয়া বিপুল-বিক্রমে ভারতের শান্তিময় তপোবনে জ্বলিয়া উঠিল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, গুজরাট হইতে মুরাদ, দাক্ষিণাত্য হইতে ঔরঙ্গজেব বিপুল যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকা উড়াইয়া, চতুরঙ্গ-দলে ভারত প্রকম্পিত করিয়া দিল্লী আক্রমণে যাত্রা করিলেন। দারা রাজকীয় বিপুল সেনাদল ও রাজপুত বীরেন্দ্রবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া, ভ্রাতাত্রয়ের প্রতিরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন। বীরহৃদয় আশু যুদ্ধোৎসাহে নাচিয়া উঠিল। ভাগ্যলক্ষ্মী যশের হিরণ্ময় মুকুট লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বি-চতুষ্টয়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

দ্বিতীয় লহরী

বিদ্রোহে সুজা

সম্রাট্ শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা, যদিও সাহসী ও পরাক্রমশীল ; কিন্তু বাল্যকাল হইতে অতি উচ্ছৃঙ্খল, বিলাস-প্রিয় ও যুদ্ধ-চাতুর্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন। প্রথম যৌবনে রমণীর রূপ-মদিরার ও দ্যূতক্রিয়ার তিনি প্রিয় উপাসক ছিলেন। তিনি কল্পনা করিতেন, তিনিই মোগলসাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ; তাঁহার ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য শত শত অনুচর তাঁহার বাসনার ইঙ্গিত ঈষন্মাত্র অবগত হইয়া, নানা দিগ্দেশ হইতে মনের মত সম্ভোগ-প্রসাদন নিত্য নূতন নিসর্গ-সুন্দরীগণকে প্রলোভনে ভুলাইয়া চয়ন করিয়া আনিত। তাহাতে তিনি বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া বঙ্গদেশের স্বভাব-সিদ্ধ প্রেম-প্রবণতায় মাতিয়া উঠিলেন। পার্ব্বত্য-প্রাচীরে শৃঙ্খলিত ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা কোমলতর প্রেমময় মর্ম্মরন্ধ্র বঙ্গে সুবাদার হইয়া তিনি বাঙ্গালায় হাটে রূপের ব্যাসাতি করিতে লাগিলেন কিন্তু শাহান্শা সুজা বীর ছিলেন। প্রেমের তুমুল তুফানের ভীষণ ঘূর্ণিপাকে আলোড়িত হইয়াও তাঁহার বীরত্বের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। বাঙ্গালার শান্তিময় বিরামকুঞ্জে সুন্দরী-কুসুম-সম্ভারে পরিবেষ্টিত, আস্তৃত, শায়িত, আলিঙ্গন-চুম্বনে বিমোহিত থাকিয়াও বীরসুলভ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন নাই।

সম্রাট্ শাজাহানের মৃত্যু-জনরব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রণয়-প্রস্ফুটিত কমলিনীদলের সাদর আলিঙ্গন-পিয়াসা মুহূর্ত্তমধ্যে প্রশমিত করিয়া, যে কোন অজ্ঞাত বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে বিলাসের আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া, বীর-দম্ভে নাচিয়া উঠিলেন। সেই বীরত্বের বিজলীতরঙ্গে দুর্গে, শিবিরে, নিস্তব্ধ পল্লীর জমীদারের ঘরে ঘরে সাজ সাজ বলিয়া বিপুল রণোদ্যমের এক অপূর্ব্ব নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। বঙ্গদেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া ভারত-সিংহাসন-জয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, সাহাজাদা সুজা দিল্লীর পথে মহোল্লাসে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। হৃদয়ে আশা, শোণিতে উৎসাহ, মস্তিষ্কে ভ্রাতৃবিদ্বেষ, প্রাণে চিত্ত-বিমোহিনী বিলাসিনীকুলের বিলোল কটাক্ষ কল্পনা ক্রোড়ে নানা ভাবের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল।

গুজরাট ও দক্ষিণাপথ হইতে মুরাদ ও ঔরঙ্গজেব তরবারি-বলে ভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া যুগপৎ বিক্রমে বিভিন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

রাজপ্রতিনিধি দারা সুশিক্ষিত রণনিপুণ অসংখ্য সম্রাট-সৈন্যকে অমিত-তেজা যোধপুরপতি যশোবন্ত সিং ও রণপণ্ডিত জয়পুররাজ জয়সিংহের নেতৃত্বে বিভিন্ন দিকে প্রধূমিত বিদ্রোহাগ্নি সমূলে নির্ব্বাপিত করিবার ও ভ্রাতাত্রয়কে বন্দী করিয়া আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা বাঙ্গলা দিল্লীর সন্নিকট। বীরবর সুজা প্রজ্বলিত আশ্বাসে সৈন্য-চালনা করিতেছিলেন। দিল্লীর সৈন্যও জয়সিংহের অধীনে সুজার প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হইতে ছিল। মধ্যপথে হিন্দুর পুণ্যতীর্থ বারানসীধামে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে উভয় সৈন্যের প্রথম সাক্ষাৎ হইল।

রাজপুত-বীরত্ব-প্রভাবে মোগল বাদসাহগণ ভারত শাসন করিতেন। রাজপুত বীরেন্দ্রগণের উপর সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়া ভীষণ রণক্ষেত্রেও মোগল সম্রাটগণ নিশ্চিন্ত মনে রঙ্গমহলে বিলাস-কৌতুকে মগ্ন থাকিতেন। আত্মপ্রাণে উপেক্ষা করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অকুতোভয়ে স্বজাতির বক্ষে অস্ত্র-চালনা করিয়া, রাজপুত বীরেন্দ্রগণ মোগল সম্রাটের সিংহাসনতলে সহাস্যবদনে জয়ের হিরণ্ময় মুকুট উপঢৌকন দিয়া ক্ষণিক প্রশংসার গৌরবে ধন্য হইতেন, দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেন! অরিন্দম জয়সিংহ সেই সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি যে যুদ্ধে গমন করিতেন, সেইখানে মোগ-লের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইত। জয়সিংহ অযথা রক্তপাত নিবারণের জন্য সম্রাট সাজাহানের উপদেশমত সুজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সুজাও এক প্রকার সন্ধির সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু সুলামাইন নামক একজন যুবক সেনাপতির উত্তেজনায় রণোন্মাদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিধানে বীর অসি আবার সশব্দে বিকম্পিত হইল।

সেদিন প্রভাতে কুজ্‌ঝটিকায় নদীবক্ষঃ আপ্লুত। সূর্য্যরশ্মিও কুজ্‌ঝ-টিকায় সমাচ্ছন্ন, সেই সময় জয়সিংহকে অপ্রস্তুত ভাবিয়া নদী পার হইয়া, সুজা সসৈন্যে জয়সিংহকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করি লেন। আজীবন বিলাসবর্দ্ধিত সুজার শরীরে যেন সিংহের অমিত বল কোন্ অনুপ্রেরণায় প্রবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষ নাশে শক্তিশালী করিল। রণোন্মাদনায়

প্রমত্ত হইয়া, উন্মাদের ন্যায় অসংযতভাবে অশ্বপৃষ্ঠে তিনি সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব দীপ্ত মুখমণ্ডল হইতে বিলাসের সকল কালিমা চিহ্নই অন্তর্হিত হইল। সৈন্যগণ অপূর্ব্ব রণোন্মাদনায় সুজার জন্য আত্মপ্রাণ তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল।

জয়সিংহ যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ রণপণ্ডিত, তাঁহার যুদ্ধ-পাণ্ডিত্য বহু রণক্ষেত্রে জীবন সঙ্কটময় করিয়া উপার্জ্জিত হইয়াছিল; তিনি সন্ধি প্রস্তাবনার ভিতরেও সুজার আক্রমণের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত ছিলেন। স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে সুজার প্রচণ্ড আক্রমণ-ঝটিকাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সেই আক্রমণ ঝটিকা বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইবামাত্রই এক অপূর্ব্ব সৈন্যব্যূহ সুসজ্জিত করিলেন। দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ কামানশ্রেণী; কামান শ্রেণী রক্ষায় বল্লম ও তরবারিধারী সহস্র সহস্র অশ্বারোহী এবং মধ্যস্থলে বন্দুকধারী মোগল ও তরবারিধারী রাজপুত সৈন্য বিরাজিত রহিল।

এইবার মহারাজ জয়সিংহ সবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। কামানশ্রেণীর কালাগ্নিসদৃশ লোহিত গোলায় প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত সুজার সৈন্য ভূপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহীদল সুযোগ বুঝিয়া সুজার সৈন্যের উভয় পার্শ্বে আক্রমণ করিল। সুজার সৈন্যগণ আক্রমণে অগ্রসর হইবামাত্র কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হইল, জয়সিংহের অশ্বারোহীদল প্রবলবেগে সুজার সেনাদলকে আক্রমণ করিল, সুজার কামান শৃঙ্খলতার দোষে অত্যন্ত পশ্চাতে ছিল, সুতরাং সুজার গোলন্দাজসৈন্য অশ্বারোহী দলকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। দিবাবসানে সুজার সৈন্যগণকে অত্যন্ত ক্লান্ত বুঝিয়া মহারাজ রণনীতিজ্ঞ জয়সিংহ মধ্যস্থ পদাতিকদলকে নিষ্কোষিত অসি হস্তে আক্রমণ করিতে অনুমতি করিলেন, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুজার সেনাদল প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ছিল, ক্লান্ত শরীরে শেষবারের নূতন অপ্রতিহত প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিতে লাগিল।

প্রচণ্ড প্রলয় ঝটিকাবেগে ধূলিরাশির ন্যায় জয়সিংহের আক্রমণে সৈন্যদল পলায়ন করিল দেখিয়া, শাহজাদা সুজাও "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক বায়ুবেগে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন না, তিনি জানিতেন সুজাকে বন্দী করিলে দারার হস্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড

অবশ্যম্ভাবী। বৃদ্ধ সম্রাট্ শাজাহানও এ বিষয়ে তাঁহাকে গোপনে উপদেশ দিয়াছিলেন। জয়সিংহ বীর ছিলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে ক্ষমা করিতে জানিতেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যুদ্ধ অবসান হইল। বৃদ্ধ বয়সে ও যুবজনের অসাধ্য পরিশ্রমে ক্লান্ত না হইয়া জয়সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিণাম—মুমূর্ষু ও আর্ত্তগণের শুশ্রূষা ও হতাহত মৃতগণকে দেখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষাদিত চন্দ্রমালোকে যাহা দেখিলেন, তাহা বর্ণনাতীত! হৃদয় বিদারণ ভয়াবহ দৃশ্য! শত শত মোগল রাজপুত। হস্তী অশ্বের মৃতদেহ স্তূপের পর স্তূপাকারে সজ্জিত, কোথাও বা হস্তপদ-ছিন্ন-মুমূর্ষু কাতর কণ্ঠে জল চাহিতেছে, কোথাও বা কেহ তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, প্রিয়জনকে ডাকিতেছে। কি ভীষণ লোমহর্ষণ মর্ম্মভেদী মহা শ্মশানের দৃশ্য! জয়সিংহ অনুচরবর্গকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শুশ্রূষা—সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে প্রথম দিনের যুদ্ধে বারাণসীর পুণ্যধামে মোগলের ভাগ্যলক্ষ্মী দারার প্রতি প্রসন্না হইলেন। সুজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

তৃতীয় লহরী

বিদ্রোহে ঔরঙ্গজেব।

বাল্যকাল হইতেই ঔরঙ্গজেব বীরত্বে, শৌর্য্যে, প্রতিভায় পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পিতার সমধিক স্নেহপাত্র ছিলেন। অসীম অধ্যবসায়, বীরোচিত সাহস, কঠোর শ্রম-সহিষ্ণুতা, সেনাপতি-পদোচিত রণপাণ্ডিত্য, ইস্‌লামধর্ম্মে গভীর আস্থা, সঙ্কল্পসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, বিলাস-লালসাহীনতা এবং অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য্য তাঁহার চরিত্রকে সমধিক সমুজ্জ্বল করিয়াছিল; কেবল হৃদয়ে ঔদার্য্যের অভাব এবং সন্দেহের বশবর্ত্তিতা তাঁহার চরিত্রকে ক্ষীণপ্রভ করিয়াছিল। জীবনের উচ্চাভিলাষ তিনি অতি সংগোপনে হৃদয়মধ্যে সমাহিত রাখিতেন। অতি প্রিয়পাত্রগণের নিকটেও ভ্রমক্রমে গুপ্ত-অভিসন্ধি প্রকাশ করিতেন না; কূট-রাজনীতি-তত্ত্বে, ষড়্‌যন্ত্র-প্রহেলিকার বিকাশে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গোঁড়া মুসলমান-সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। হিন্দু অথবা বিভিন্নধর্ম্মী সম্প্রদায়কে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করিতেন। নিজহৃদয়-নিহিত উচ্চাভিলাষ-পরিপূরণার্থ তিনি অকুতোভয়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার অসাধ্যসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। সেই উচ্চাভিলাষের প্রবল বহ্নি হৃদয়ে জ্বালাইয়া, পরম আয়াসে আজীবন প্রাণপণে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছিলেন। সে প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে বিমোহিনী সুন্দরীর প্রেমসুধাধারা বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত। ভরতপুরের পাষাণ-দুর্গের মত ঔরঙ্গজেবের পাষাণ-কঠোর-হৃদয়ে রমণী-কটাক্ষ প্রবেশ করিতে পারিত না, এই উচ্চাভিলাষ সার্থক করিবার জন্য তিনি সেই প্রচণ্ড বহ্নিতে ভ্রাতৃশোণিত আহুতি দিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা—মোগল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুবর্ত্তন নীতিসঙ্গত নহে,—শান্তিপ্রিয় মুমূর্ষু সম্রাট্ শাজাহান অথবা বিধর্ম্মী দারা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সুজা, মদিরা-বিভোর মুরাদ, ইহাদের কেহই সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত নহে। আমি বীর—রাজদণ্ড পরিচালনে উপযুক্ত, আল্লা আমাকে বীর করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এই তীক্ষ্ণধার তরবারির শৌর্য্য-প্রভাবে ভারতের সিংহাসনে আমার বসিবার পথ অচিরে উম্মুক্ত হইবে চিরতুষার-মুকুটিত

অভ্রভেদী হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রোর্ম্মীচুম্বিত কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত আমার পদানত হইয়া থাকিবে।

ঔরঙ্গজেব এইরূপ উচ্চাশা হৃদয়ের শোণিতে শোণিতে পোষণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের শাসনভার লইয়া শক্তিসঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সম্রাটের পীড়া, দারার প্রতিনিধিত্ব, শাসনশৈথিল্য, সেনাপতি ও ওমরাহগণের বিভিন্ন ভ্রাতার প্রতি পক্ষপাত, প্রতিদ্বন্দী চতুষ্টয়ের সিংহাসনের আশা জনসাধারণের লোকমত প্রভৃতির প্রতি তাঁহার নেত্র কর্ণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। ষড়্‌যন্ত্রচতুষ্টয় কি ভাবে আবর্ত্তিত-বিবর্ত্তিত হইয়া, কাহাকে ডুবাইয়া কখন্ কাহার অনুকূলে, কখন্ কাহার প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতেছে, কোন্ তরঙ্গের পর কোন্ তরঙ্গ-প্রবাহ আসিলে কে উন্নতির শীর্ষে আরূঢ় এবং কাহার আশা চিরতরে অতল সলিলে নিমজ্জিত হইবে, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যেন নখদর্পণে দর্শন করিতেন।

বৃদ্ধ শাজাহানের মৃত্যু-জনরব তাঁহার নিকট যেন মঙ্গল-আহ্বান বলিয়া বোধ হইল। মহোৎসাহে নিজসৈন্য সমাবেশ করিয়া, বিধর্ম্মী দারাকে বিতাড়িত করিয়া, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিতে—তিনি সৈন্যগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন ইত্যাদি অগ্নিস্রাবী উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করিয়া বীর-গর্ব্বে দিল্লীর পথে যাত্রা করিলেন। দুর্জ্জয় সাহসে তিনি পঞ্চসহস্রমাত্র সৈন্য লইয়া দিল্লীর তথা উভয় ভ্রাতার অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযান করিয়াছেন বুঝিয়া মনে মনে নিজেই হাস্য করিলেন। ঔরঙ্গজেব অদূরদর্শী ছিলেন না, এ অভিযানের স্রোত কোন্ পথ দিয়া প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি জানিতেন, ধর্ম্মোৎসাহী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুষ্টিমেয় লোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান পতাকা উড্ডীন করিতে পারে।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে হিন্দুকীর্ত্তি-বিমণ্ডিত উজ্জয়িনীনগরীতে খরস্রোতা সিপ্রা তীরে, তিনি শিবির সন্নিবেশ করিয়া কনিষ্ঠ মোরাদবক্সের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে কূট চক্রান্ত, শোণিতে লাভা-প্রবাহ, হৃদয়ে উচ্চ আশা, প্রাণের ভিতর বিজয়-দুন্দুভির নিনাদ যুগপৎ তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে দারাপ্রেরিত সৈন্যদল যোধপুরপতি বীরবর যশোবন্ত সিংহ ও কাসেম খাঁর নেতৃত্বে সিপ্রার অপর তটে শিবির সমাবেশ করিয়াছিল। দুইদিকে দুই মহাবীর ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় অমিতবিক্রম হৃদয়ে স্তব্ধ থাকিয়া সুযোগ প্রতীক্ষায় স্বল্পসলিলা সিপ্রা নদীর খরস্রোতের ব্যব-

ধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুদ্ধোন্মাদনায় বীর-হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত দ্বিগুণতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহাপ্রাণ রাজপুত-বীরেন্দ্র যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজেবের সৈন্যসংখ্যা অল্প দেখিয়া, উপেক্ষায় মনে মনে হাসিয়া তাঁহাকেই প্রথম আক্রমণে সুযোগ দিবেন স্থির করিয়া, নিশ্চেষ্ট রহিলেন, কিন্তু এই নিশ্চেষ্টতার ফলে মোগলের ভাগ্য-রবি দারার ভাগ্য ছাড়িয়া ঔরঙ্গজেবের ভাগ্যচক্রে সমুজ্জ্বল হইল।

চতুর্থ লহরী।

— -০-

বিদ্রোহে মুরাদ।

সম্রাট্ শাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মুরাদবক্স অত্যন্ত সুরাপায়ী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। রাজকার্য্যের অবসরে প্রেমপ্রফুল্ল কমলিনীদলের মত রূপসীদলে সর্ব্বদা পরিবৃত হইয়া, সিরাজীর ফোয়ারায় অবিরত স্নাত হইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। সুন্দরীকুল-গরবিণী বেগম-উপবেগমগণকে লইয়া তিনি সর্ব্বদা নানারঙ্গে মাতিয়া থাকিতেন। গীতবাদ্যের অনাবিল নির্ঝরে, চারুহাসিনী নর্ত্তকীর অধীরমঞ্জীরশোভিত পদের রুনু ঝুনু তাঁহার কর্ণবিবরে যেন সুধাধারা ঢালিয়া দিত। তাঁহার অবাধ বিলাস-সমুদ্রে নিত্য নূতন সুখের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া, তাঁহার কর্ম্মজীবনের সকল আশা ও কর্ত্তব্য ভাসাইয়া দিত। তিনি যখন সম্রাট্ শাজাহানের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রেমের সুরে সাধা, প্রাণের সুরে বাঁধা, আত্মবিনোদন বীণায় উলঙ্গবাহার রাগিণীর বিচিত্র আলাপ চলিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে পাত্রে পাত্রে সিরাজীর গোলাপী নেশা ফিরিতেছিল। হাসি-চাহনীতে বিদ্যুৎ হানিয়া, কয়েকটি মনোমোহিনী সুন্দরী বক্ষের সমুন্নত মহিমা সগৌরবে বিকসিত করিয়া, মেহেদীরাগরঞ্জিত রক্তপদের নূপুরের ধ্বনির সহিত বাদ্যযন্ত্রের তাল মিলাইয়া, উলঙ্গবাহার রাগিণী বিকাশ করিয়া, চোকে মুখে, বুকে রূপেরপ্রভা ছড়াইয়া, রূপরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। আত্মবিস্মৃত মুরাদ সুন্দরীকুল পরিবৃত হইয়া নির্ণিমেষ-চক্ষে সেই রস-সায়রে ডুবিয়া সৌন্দর্য্যকলা উপভোগ করিতেছিলেন। শাজাহানের মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র তিনি হর্ষভরে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে আর কি, এইবার আমি দিল্লীর সম্রাট!" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সুন্দরীগণ হাস্যমুখর-কণ্ঠে সম্রাটের জয়ধ্বনি করিল। রঙ্গকক্ষ হইতে সভায় আসিয়া মুরাদ অচিরে সম্রাট্ হইবেন সে কথা পরিষদগণকে বলিলেন; ওমরাহ ও সেনানীগণ সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া অভিনন্দন করিল। রাজধানীতে উৎসবের আনন্দ-রোল পড়িয়া গেল। মুরাদ রাজকোষ হইতে দরিদ্রগণকে অজস্র অর্থ দান করিলেন। তিনি যে দিল্লীর সিংহাসনে অচিরে উপবেশন করিবেন, সে বিষয়ে আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এ সম্ভাবনা নিতান্ত নিরর্থক নহে; কারণ,

মুরাদের অধীনে যত সৈন্য ছিল, সম্রাটের দুর্গ ভিন্ন অপর কোথাও তত সৈন্য ছিল না ; তাহার উপর তিনি রণনিপুণ সেনাপতি।

অতি শীঘ্র সিংহাসনে উপবেশনের জন্য তিনি সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এক ঔরঙ্গজেব ভিন্ন কেহই তাঁহার প্রতিরোধে সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না। সেই অসংখ্য বলদর্পিত সৈন্য উপযুক্ত রণসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া আশীটী কামান ও চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, বিসর্পিতগতিতে হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আশা-প্রলুব্ধ মুরাদ আত্মবিশ্বাসে এতদূর নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, যুদ্ধঅভিযানের সঙ্গে বিভিন্নযানে রূপসীগণকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। উজ্জয়িনীর গৌরবময় ক্ষেত্রে বিপক্ষ-দলের শিবির-চূড়ে পতাকামালা উড্ডীন দেখিয়া তিনিও যুদ্ধ-বিক্রম প্রদর্শনের শিবির সন্নিবেশ সন্নিবেশ করিলেন।

পঞ্চম লহরী

―――০―――

ভ্রাতৃ-সম্মিলনে।

তরঙ্গভঙ্গময়ী সিপ্রার উভয় তীরে সারি সারি অগণন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুভ্র শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত। তীরে সমতল ভূমিতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের ও সেনাপতি কাসিম আলির এবং পার্ব্বত্য উপকূলে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের অসংখ্য শিবির। বাসন্তী সন্ধ্যা—ধীর চন্দ্রমা যেন যুদ্ধ আয়োজন দর্শনে অর্দ্ধবিকশিত হইয়া, অতি ধীরে বসন্ত-সমীরণের পুলকপ্রবাহে মৃদুমন্দ হাসিরাশির মত স্নিগ্ধরশ্মিমালা উল্লাসে উল্লাসে ছড়াইয়া দিতেছিল। সেই নিসর্গ-কিরণমালা মোগল-রাজপুত সম্মিলিত শিবিরনিচয়ের শীর্ষে সমুজ্জ্বল ভাতিতে বিবম্বিত হইতেছিল; মৃদুমন্দ মলয়-হিল্লোলে উভয় শিবির-নিবদ্ধ পতাকা-নিচয় যেন আনন্দ-উৎসাহে প্রকম্পিত হইয়া পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছিল,—তাহারা যেন যুদ্ধোদ্যমে ব্যাকুল, যুদ্ধসংঘর্ষ দেখিতে ব্যস্ত, উদ্যম-সমীরে হিল্লোলিত হইয়া, বীরেন্দ্রগণকে এই আসন্ন যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে।

সিপ্রাও যেন আজ উল্লাসিনী। একে বসন্তের সন্ধ্যা—চন্দ্রমা মিলনে মলয়-পবনে প্রেম-গীতের নূতন লহর ছুটিতেছে,—তাহাতে বহুদিন পরে বিক্রমাদিত্যের পদরেণুপূত বীরত্ব রঞ্জিত তটে,—আজ আবার ভারতের ভাগ্য-পরীক্ষা! সমবেত বীরেন্দ্রগণের রণোৎসাহে তাহার শীর্ণকায় যেন ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে;—বীরশোণিতের প্রবাহে অনুরঞ্জিত হইবার জন্য যেন সিপ্রাও ব্যাকুলা।

যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রি। চতুর্দ্দিক্ নীরব—নিস্তব্ধ; আকাশে চন্দ্রমা উপহাসের হাসি হাসিতেছে;—যেন বলিতেছে, কয়দিনের জন্য এ জয়-পরাজয়? নশ্বর সংসারে, নশ্বর সিংহাসনে—কে কবে কালজয়ী হইয়াছে? শিবিরে সৈনিকদল কোথাও নিদ্রিত, কোথাও আক্রমণের কল্পনায় ব্যস্ত,—কোথাও নৃত্য-গীতের তরঙ্গে মোহিত,—কোথাও সুন্দরীর কটাক্ষে ব্যথিত, কোথাও বিলাসে সমাহিত,—কোথাও মদিরা ও গঞ্জিকার সেবায় উন্মত্ত,—কোথাও কোন সৈনিক-যুবক প্রিয়তমাকে শেষ-পত্র লিখিতেছে,—কোন সৈনিক

অস্ত্রে ধার দিতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রহরীর পাহারার ভৈরব চীৎকার নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে,—সেই তালে কুকুর ও শৃগালদল তান দিয়া, ভীষণ আরাবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে ;—কাল যুদ্ধ সুনিশ্চিত।

ভাবী সম্রাট ঔরঙ্গজেব রাজপারিপাট্যহীন মোল্লাসুলভ শুভ্র বসনে বরবপু সুশোভিত করিয়া নিজ শিবির-প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া, একাকী মুরাদের শিবিরাভিমুখে অভিগমন করিলেন। তাঁহাকে একাকী বিপক্ষপক্ষের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রহরীরা চমকিত হইল ; কিন্তু সেই স্পর্দ্ধাদীপ্ত তেজোময় মূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইল না। ঔরঙ্গজেব নিজ সৈন্য শ্রেণী ভেদ করিয়া, অবিচলিতভাবে মুরাদের বাহিনীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কেহই প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না—সকলেই বিভ্রান্তনয়নে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা সৈনিকভেরীর নিনাদে সাবধানতা সূচিত হইল ;—প্রহরী ও সৈন্যগণ আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় সতর্ক রহিল।

মুরাদ স্বয়ংসিদ্ধ সম্রাট্ হইয়া যুদ্ধ আয়োজন করিয়াছেন,—তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ-সম্ভারের সহিত প্রচুর বিলাস-উপকরণেরও অভাব ছিল না ; যুদ্ধাভি-যানের সঙ্গে অনেকগুলি রূপের মানোয়ারী জাহাজ আসিয়াছে। যে সকল রূপসীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, যাঁহাদের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া তিনি মধুরাবেশে বিভ্রান্ত হইতেন, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুসম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি সেই প্রিয়তমাগণকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই।

প্রকাণ্ড পট্টবস্ত্রমণ্ডিত শিবিরে মুরাদ যুদ্ধের পূর্ব্বনিশায় রঙ্গিণীগণকে লইয়া বিলাস-রঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন। শিবিরটী বহুমূল্য আবরণে পরিবেষ্টিত,—উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শালের পর্দ্দা বিলম্বিত,—রাশি রাশি পুষ্প-সম্ভারে সুসজ্জিত,—বিভিন্ন বর্ণের কারুকার্য্যখচিত পতাকা ও মস্‌লিন আস্তরণে আস্তৃত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলীকৃত। স্নিগ্ধ দীপাবলী, পুষ্পসম্ভার, বহুমূল্য সুগন্ধ-প্রসাদন এবং কারুকার্য্য-খচিত সুবর্ণাধার;উৎকৃষ্ট প্রজ্বলিত ধূপ-সৌরভে সেই শিবির-প্রকোষ্ঠে এক অপূর্ব্ব অমিয়গন্ধ তরঙ্গায়িত হইতেছিল। সেই বিভ্রান্তকারী সৌরভের মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে বহুমূল্য সিরাজীর পাত্র সুন্দরীগণের হস্তে হস্তে ফিরিতেছিল। বিলোল-কটাক্ষে সুধাধারা ঢালিতে ঢালিতে রঙ্গিণীগণ মুরাদকে সিরাজী-সুধায় পরিতৃপ্ত করিতেছিল।

আলোকমালার জ্যোতি,—পুষ্পরাশির সুষমা-ভাতি,—বিলাসিনীগণের

রত্নালঙ্কারের দীপ্তি,—চটুল বিলাস-কটাক্ষের প্রীতি,—উচ্ছ্বলে—মধুরে-সম্মোহনে—বিনোদনে বিজলীর লহর খেলিতেছিল। বিলাস-পিয়াসায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, লালসার ক্রীতদাস মুরাদ কখন সুধাপাত্রে, কখনও রঙ্গিণীর বদন-সুধাকরে মধুলোলুপওষ্ঠাধর স্পর্শ করিতেছিলেন, প্রবল উল্লাসে নৃত্য-গীতের উচ্ছ্বাস বহিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে শুভ্রবেশধারী ঔরঙ্গজেব খোজা প্রহরীগণের প্রতিরোধ না মানিয়া, শিবিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "জয়, সম্রাট মুরাদের জয়!"

মুহূর্ত্তে গীত-বাদ্য বন্ধ হইল, স্খলিত-চরণে সিংহাসন হইতে উঠিয়া, মদিরা-বিহ্বল মুরাদ সাদরে ঔরঙ্গজেবের অভ্যর্থনা করিলেন। রঙ্গিণীগণ অনিচ্ছায় তৎক্ষণাৎ শিবির পরিত্যাগ করিল।

কুটিলচূড়ামণি ঔরঙ্গজেব আজ কি মধুর সরল হাসি হাসিতেছেন! কি সম্মানসহকারে মুরাদকে সম্রাট বলিয়া শতবার কুর্ণিস করিতেছেন, আর আশুপ্রত্যয়ী মুরাদ অপূর্ব্ব গর্ব্বে গলিয়া যাইতেছেন। মুরাদের আমন্ত্রণে ঔরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন আরম্ভ করিলেন। ভোজনশেষে মদিরা ও কাফি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার রঙ্গিণীগণ আসিয়া রাজপুত্রগণের চিত্তবিনোদনের জন্য সুললিত-কণ্ঠে সুমিষ্ট হাসি মিলাইয়া গান ধরিল।

সঙ্গীতাবসানে আবার নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল। ঔরঙ্গজেব সুবর্ণপাত্রে মদিরা ঢালিয়া মুরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "সম্রাট মুরাদ! আজ আমার জীবন সার্থক, কালিকার যুদ্ধে তোমাকে ভারতের সম্রাট করিয়া আমার জীবন ধন্য করিব।"

একমুখ হাসি হাসিয়া মুরাদ বলিলেন,"আপনার ন্যায় ভ্রাতা জগতে দুর্ল্লভ আপনি একটু এই সুগন্ধি সুধা আস্বাদন করুন।"

অধিকতর নম্রতার সহিত ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "ক্ষমা কর, আমি ভোগ-বাসনা ছাড়িয়া ফকির হইয়াছি। তোমার মত বীরকে ময়ূরসিংহাসনে বসাইয়া, ভারতে মুসলমান-রাজ্যের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় করিয়া, চিরদিনের মত পয়গম্বরের সেবায় মক্কায় যাত্রা করিব; ইহা ভিন্ন আর আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।"

মুরাদ। প্রিয় ভ্রাতা! আপনি যথার্থই ধর্ম্মপ্রাণ। নচেৎ আমার জন্য আপনি এরূপ আত্মোৎসর্গ করিবেন কেন?

ঔরঙ্গজেব। তোমার জন্য করিব না তো কাহার জন্য করিব? পয়গম্বরের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তুমি ভিন্ন আর কে তৈমুর-সিংহাসনে উপবেশনের উপযুক্ত? সুজা ভীরু, দারা কাফের। তোমার সাহস অপরিসীম, যশে ভারতপূর্ণ। তোমার সম্মুখে আমি তোষামোদ করিতেছি না। তোমার ললাটে সম্রাট-টীকা, বিশাল বক্ষ, দীর্ঘ বাহু, সর্ব্বদেহ বীরত্বে অনুরঞ্জিত। তুমিই একমাত্র ভারত-সিংহাসনের উপযুক্ত।

এই বলিয়া ঔরঙ্গজেব আর এক পাত্র মদ ঢালিলেন।

মোরাদ। তবে কালবিলম্বে কাজ নাই, কালই আমরা যুদ্ধ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিব।

ঔরঙ্গ। আমি চিরজীবন ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি, ইস্‌লামের নামে ফকির হইয়াছি, যুদ্ধনীতিতে আমি অনভিজ্ঞ। তুমি সাহস দিলে তোমার আজ্ঞা-পালনে আত্মনিয়োগ করিব।

আত্মাভিমানী মোরাদ এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ তোষামোদে ও মদিরা-বিবশে আত্মগৌরবে লাফাইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনি আমার শিক্ষায় কালে রণপণ্ডিত হইবেন। আমি এই অসির সাহায্যে পৃথিবী জয় করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি অসি উন্মুক্ত করিলেন। প্রদীপ্ত আলোক-তেজে তীক্ষ্ণধার অসি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই শিথিলমুষ্টি হইতে অসিখানি স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল।

কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া, ঔরঙ্গজেব মোরাদকে আর একপাত্র মদ দিলেন;—বলিলেন, "কল্য রণক্ষেত্রে তোমার পার্শ্বে এ অনুচর উপস্থিত থাকিবে।"

ভ্রাতাকে বিদায় আলিঙ্গন দিবার উপক্রমে মাতাল মোরাদ স্খলিতপদে পতিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। মনে মনে হাসিয়া ঔরঙ্গজেব মনে মনে বলিলেন,—"বীর বটে! বীর না হইলে কি কে এমন শূকরের মত গড়াগড়ি যায়?" ঔরঙ্গজেব বিদায় হইলেন।

শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঔরঙ্গজেব গম্ভীরবদনে নিজ শিবিরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার ললাটে গাঢ়-চিন্তার রেখা সমঙ্কিত। মনের ভিতর নানা ভাবের প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল; মানস-সরে নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল। ঘাত-প্রতিঘাতে আশার উদ্বেগে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে কে বসিবে? বিধর্ম্মী দারা, না বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট পিতা

শাজাঁহা,—না বিলাসী কাপুরুষ সুজা,—না এই দুরন্ত মাতাল মোরাদ,—না এই দৃঢ়ব্রত সন্ন্যাসী ঔরঙ্গজেব? মোরাদ! কাল প্রভাতে যুদ্ধ,—আজ তুমি বিলাসবিভোর! তুমিই ভারতের সম্রাট্ হইবে! যত দিন প্রয়োজন,—তত দিন তোমার দ্বারা স্বকার্য্যসাধন করিব;—পরে পদাঘাতে তোমায় বিতাড়িত করিব। উঃ! পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতেছি! কাল যুদ্ধ—পিতৃ-বিদ্রোহ! এই উজ্জয়িনী হইতে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত রাজপথ ঔরঙ্গজেবের বীরত্বে শোণিত-রঞ্জিত হইবে, নচেৎ ঔরঙ্গজেবের শোণিতে সিপ্রাসলিল অনুরঞ্জিত হইবে। না,—না,—ঔরঙ্গজেব ভারতের সম্রাট্;—সুনিশ্চিত। এই ধর্ম্মার্থে ভূতলশায়ী মস্তকে আমি তৈমুরের মুকুট সগর্ব্বে ধারণ করিব, নচেৎ আত্মনিবেদনে এ সাধনার সমাপ্তি করিব। কাল যুদ্ধ—কি হয়—কি হয়—রণে জয় পরাজয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জয় লক্ষ্মী ঔরঙ্গজেবের ভাগ্যে।

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনী-ক্ষেত্রে মোগলরাজপুতের ভীষণ সংঘর্ষ হইল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত পরদিনের প্রাতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সহসা দেখিলেন, ঔরঙ্গজেব প্রবল উদ্যমে নিজ সৈন্যগণকে সিপ্রানদী পার করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ঔরঙ্গজেব পর্ব্বতের উন্নত স্থানে কামানশ্রেণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়াছেন। ঔরঙ্গজেব নিজ কামানের অগ্নি-বর্ষণে বিপক্ষ পক্ষকে প্রতিরোধ করিয়া, নিজ সৈন্য পার করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

মহারাজা যশোবন্ত সিংহও কামানশ্রেণী সুসজ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঔরঙ্গজেবের সৈন্যকে অতর্কিতভাবে নদী পার হইতে দেখিয়া তাঁহার কামানশ্রেণী হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে কালান্তক অগ্নিরাশি বর্ষিত হইয়া মোগলসৈন্যগণকে গ্রাস করিতে লাগিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের উদ্দীপনায়, আজ মোগলসৈন্য রণমদে মাতোয়ারা,—তাহারা মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া, প্রবল গোলা-বর্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া যুগপৎ উৎসাহে ও প্রচণ্ড বেগে নদী পার হইতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব পূর্ব্ব হইতেই যশোবন্ত সিংহের সহযোগী কাসেম খাঁকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। কাসেম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান রহিলেন এবং যখন প্রচণ্ডবিক্রমে যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সময় তিনি গোলন্দাজ সৈন্য ও বারুদ লইয়া পলায়ন করিলেন। সহযোগীর ব্যবহারে মহারাজ যশোবন্তসিংহ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন; কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া অমানুষিক বীরত্বে শত্রুগণের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশমত ঠিক সময়ে কাসেম খাঁ পলাইয়াছেন। তিনি মোরাদকে উত্তেজিত করিয়া বলিলেন, "যশোবন্তসিংহের বিক্রমে কোন সৈন্যই পার হইতে পারিতেছে না। সম্রাট্ স্বয়ং একবার সৈন্য-চালনা করিয়া দেখুন, আমি অপারগ হইয়াছি।" অভিমানদর্পী মোরাদ কতিপয়মাত্র সৈন্য লইয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জয় জয় রবে নদী পার হইলেন। তাঁহার

সৈন্যগণ প্রভুকে এরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রবলবিক্রমে নদী পার হইতে লাগিল। যশোবন্তসিংহের রণভাণ্ডার তখন বারুদ-হীন—তাঁহার কামান নীরব। তিনি কূল ছাড়িয়া ঈষৎ পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া বিপক্ষপক্ষের প্রতীক্ষায় রহিলেন। মহোল্লাসে মোরাদ ও ঔরঙ্গজেব উভয়ে সেই সময় অবাধে নদী পার হইয়া বিপুলবিক্রমে একযোগে মহারাজ যশোবন্তসিংহের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। অসমসাহসী রাজপুত সৈন্যগণ স্বজাতীয় গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। সপ্ত সহস্র রাজপুত-সৈন্য সেই দিন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। প্রিয় অনুচরগণকে হারাইয়া, বিপক্ষের প্রহারে নিজে জর্জ্জরিত হইয়া, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর সৈন্য লইয়াও যশোবন্তসিংহ আরও তিন ঘণ্টা যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলভাগ্য নিরূপণে আত্মোৎসর্গ করিলেন। মহারাজ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সাহসে রাজপুত-গৌরব হইলেও যুদ্ধ-চাতুর্য্যে ঔরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন না। নচেৎ ভ্রাতৃ-সম্মিলনের অবসর না দিয়া তিনি উভয়কে একে একে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারিতেন। তাঁহার বিক্রম সম্মুখ-যুদ্ধে আত্মপ্রাণ উৎসর্গে নিবেদিত হইলেও তিনি রণকৌশলে রণবিজয়ে সফলকাম হইলেন না। সন্ধ্যাকালে ঔরঙ্গজেব যেন নৈসর্গিক অনুপ্রেরণায় নূতন-বলে সৈন্য-চালনা করিতে লাগিলেন। ক্লান্ত মোগলগণের শরীরে বীরশোণিত দ্বিগুণতরভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই বীরত্বের প্রভাবে কাতারে কাতারে রাজপুত-সৈন্য যুদ্ধে প্রাণাহুতি দিল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া, সান্ধ্য-আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাজ যশোবন্তসিংহ পাঁচ শতমাত্র সৈন্য লইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। গোধূলিসময়ে মোগলের ভাগ্য-লক্ষ্মী ঔরঙ্গজেবের উপর প্রসন্না হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরাজয়ে দারা।

মহারাজ যশোবন্তসিংহের পরাজয় ও পলায়ন-সংবাদ যথাসময়ে দিল্লীতে প্রচারিত হইল। ভগ্নদূতমুখে পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ময়ূর-সিংহাসন উপবিষ্ট দারা এক অনাহূত অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, পর-মুহূর্ত্তেই আত্মসংবরণ করিয়া ক্রোধদীপ্ত-নয়নে রাগে ও ক্ষোভে স্পন্দিত হইয়া পাদপীঠে সরোষে পদাঘাত করিলেন। তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় হইতে ক্রোধাগ্নি যেন বিদ্যুতাগ্নির স্ফুলিঙ্গচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। যুদ্ধোন্মাদনায় তাঁহার পিধানে সশব্দে তরবারি ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল।

ক্রোধের মাত্রা ঈষৎ প্রশমিত হইলে গম্ভীরগর্জ্জনে দারা বলিলেন, "বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি, আমি বালক নহি। আমি ভারতে সাম্রাজ্য-পরিচালনে স্পর্দ্ধা রাখি। আমার চক্ষে ধূলি দেওয়া যশোবন্তের বুদ্ধিতে কুলাইবে না। আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি রাজপুত! অর্থলোভে স্বদেশগৌরবে উপেক্ষা করিয়া, বীরত্বের মর্য্যাদা ভুলিয়া, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-হস্তে পরাজয় স্বীকার করিবেন না; কিন্তু দেখিতেছি, টাকায় সব হয়। আচ্ছা, ঔরঙ্গজেব! খুব একচাল চালিয়াছ।"

নতজানু হইয়া বিনয়নম্র-স্বরে দূত বলিল, "সম্রাট্! আপনি মহারাজ যশোবন্তসিংহের উপর অযথা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি রাজপুত। তিনি এবং অন্যান্য রাজপুত-বীরেন্দ্রমণ্ডলী যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় পৃথিবীর কোন যুদ্ধক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। যখন ভীরু কাসেম খাঁ সৈন্য ও বারুদ লইয়া পলায়ন করিল, মেঘ-রাশির ন্যায় মোগল-সেনা আসিয়া রাজপুতগণকে পরিবেষ্টন করিল, রণ-ক্ষেত্র যখন ধূম-ধূলা-সান্ধ্য-অন্ধকারে গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখনও মহারাজ কেবল রাজপুতবীরোচিত সাহসে অসির উপর নির্ভর করিয়া উন্মত্ত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; রাজপুত-শোণিতে প্লাবিত, উপত্যকা, সিপ্রা-সলিল রক্ত-প্রবাহে অনুরঞ্জিত হইল। অসংখ্য মোগল-সৈন্যে পরিবেষ্টিত ও অতি অল্পসংখ্য রক্ষিসৈন্য মাত্র লইয়া মহারাজ যশোবন্ত

ঔরঙ্গজেব ও মোরাদের সহস্র আক্রমণ উপেক্ষায় উড়াইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। পদতলে প্রিয়তম বীরেন্দ্রগণ হত, রক্ষী সৈন্য ক্ষীণতর, বিপক্ষের জয়নাদে অম্বরতল বিকম্পিত ; কিন্তু তথনও পর্য্যন্ত মহারাজ অবিচলিত, মহারাজ যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, অভ্রভেদী বিন্ধ্যাচল এবং কল্লোলিনী সিপ্রা তাহার সাক্ষী। অবশেষে আট সহস্র সৈন্যের পাঁচ শতমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া অগত্যা মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

মর্ম্মভেদী ক্ষোভে স্তব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দারা বলিলেন, "ধন্য মহারাজ যশোবন্তসিংহ ! ধন্য রাজপুতগণের বীরপণা ! আচ্ছা, ঔরঙ্গজেব ! তোমার সমুচিত শিক্ষা আমি নিজেই দিব। সম্রাট্-সৈন্যের অবমাননা করিয়া, প্রকাশ্যে রাজবিদ্রোহী হইয়া তুমি পৃথিবীর অপর প্রান্তে গেলেও রাজরোষের করাল কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না।" দারা স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেনানিবৃন্দকে লক্ষাধিক সৈন্য সুসজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

বহু দিন দিল্লী নগরীতে বিলাস-শান্তির তরঙ্গ বহিতেছিল। সৈন্যগণ কেল্লায় মদিরাঘোরে ও বিলাসে বিভোর ছিল। তরবারিসমূহ বৈরী-শোণিতপানে পিয়াসা শান্তি করিতে না পারিয়া মরিচায় অঙ্গরাগ সম্পন্ন করিতেছিল, কামানের বারুদ অভিমানে গলিতেছিল, বন্দুক অবিরত মনুষ্য প্রাণ উড়াইয়া দিতে না পারিয়া নিশ্চল প্রহরীর স্কন্ধে বিরাজিত ছিল, সাঙ্গীনরা সূর্য্যকরে বিভাষিত না হইয়া অন্ধকার কোষে নিবদ্ধ ছিল। সৈন্যগণ গুলি-সন্ধান ভুলিয়া রমণীকটাক্ষ-ঈক্ষণে ব্যথিত ছিল। হঠাৎ এরূপ প্রবল যুদ্ধোদ্যমে সকলেই সন্ত্রস্ত, বিপদ্গ্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। উদ্দীপনার লেশমাত্র নাই, তথাপি সম্রাটের আজ্ঞা, বীরসাজে যুদ্ধে যাইতে হইবে, কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়-পরাজয় নির্ণয় করিতে হইবে। কাজেই একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই রণসজ্জায় ব্যস্ত ; দিল্লীর জনকল্লোলে গৃহে গৃহে যুদ্ধকথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। সকলেই অবশ্যম্ভাবী অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় বিহ্বল।

এই লক্ষাধিক মহতী মোগলবাহিনী যুদ্ধজয়ী সুশিক্ষিত। সিংহাসনরক্ষী যোদ্ধৃবর্গ বিভিন্ন দুর্গ হইতে দারার সমুন্নত পতাকামূলে শ্রেণীবদ্ধভাবে সমবেত হইতে লাগিল। দারা নিজে বীরবেশে সুসজ্জিত হইয়া, রণদুর্ম্মদ আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া সৈন্য-পরিচালনে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে অশ্বযূথযুক্ত

কামানশ্রেণী, পরে গোলন্দাজ-সৈন্য,তৎপশ্চাতে শাণিত সাঙ্গীন, বর্শা ও সমুজ্জ্বল বন্দুকধারী পদাতিক দল, পরে পতাকা-বাহী ও তরবারি, রণকুশল রণদুর্ম্মদ অশ্বারোহীদল উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হইয়া সেই বিরাটবাহিনী বলদর্পিতভাবে চলিতে লাগিল। বালসূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণ—উন্নত সাঙ্গীনে,অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণে প্রতিফলিত হইয়া দারার প্রাণে নব আশার সঞ্চার করিতে লাগিল। তিনি মোরাদ ও ঔরঙ্গজেবের প্রতীক্ষায় সম্বল নদী-তীরে শিবির-সংস্থাপন করিলেন।

মোরাদ ও ঔরঙ্গজেব জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, দিল্লী-বিজয় অদূরবর্ত্তী মনে করিয়া যুগপৎ সাহসে প্রচণ্ড বিক্রমে সসৈন্যে সম্বল-তীরে উপনীত হইলেন। বিলম্বে অসহিষ্ণু মোরাদ সেই দিনেই নদী-পার হইয়া মহারাজ যশোবন্তসিংহের মত দারার সৈন্যকে পরাভূত করিবার জন্য ক্লান্ত সৈন্যগণকে উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রণ-কৌশলচতুর ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, স্বয়ং দারা কর্ত্তৃক পরিচালিত এই অসংখ্য সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইলে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইতে হইবে। সুতরাং তিনি সেই রাত্রেই দারাকে ভুলাইবার জন্য শূন্য শিবির ফেলিয়া নিঃশব্দে অন্ধকারে সসৈন্যে আগ্রার পথে প্রস্থান করিলেন ;—আগ্রার ৭।৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যামগড়ে যমুনা-তীরে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে দারার সৈন্যগণ দেখিল, বিপক্ষ-শিবির শূন্য। ঔরঙ্গজেবের বুদ্ধিচাতুর্য্যে পরাজিত হইয়া বিস্ময়াপন্ন দারা সহচর সেনানীবৃন্দকে যথেষ্ট অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্যামগড়াভিমুখে অভিযান করিলেন।

শ্যামনগরে উপনীত হইয়া উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া চারি দিন নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। কেহ কাহাকে আক্রমণের ছিদ্র খুঁজিয়া পাইলেন না। পঞ্চম দিবস প্রাতে দারা বিপক্ষ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিবার জন্য রণসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। সেই মহতী অনীকিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সমভাগে রাজপুতরাজ রামসিংহ ও চত্তরশাল, দক্ষিণদিকে কালীউল্লা এবং মধ্যে স্বয়ং দারা সেনাপতিত্বের ভার গ্রহণ করিলেন। প্রবলবিক্রমে তিন বীর বিপক্ষবাহিনী ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। রণসূচনার প্রথম ঘণ্টাতেই দারা বিজয়ী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

ঔরঙ্গজেব পূর্ব্ব হইতেই সেনাপতি কালীউল্লাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থভুক্ সেনাপতি যুদ্ধের অভিনয় করিয়া বিপক্ষ পক্ষকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যশ্রেণী ঝটিকাবেগে তুলারাশির ন্যায় উড়িয়া যাইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ তাঁহার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিল।

ঔরঙ্গজেব সহসা দারার সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। ঠিক সেই সময় একটি অদৃশ্য হস্তচালিত গুলিতে রাজপুত বীর রামসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাজপুত বিক্রমে সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ করিয়া ছত্রশাল প্রাণপণে মুরাদ সৈন্যের সহিত অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

অতঃপর দারার সৈন্য উভয় দিক হইতে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ সৈন্যদলে নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। দারার সৈন্য অধিকাংশই অশ্বারোহী। দারার জন্য আজ তাহারা যে অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিল, তাহা বীরত্বের ইতিহাসে অতুলনীয়, সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের সৈন্যও আজ নির্ভীক, রণজয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সান্ধ্য অন্ধকারে দিনমণি লুক্কায়িত হইবার মুহূর্ত্তে রণোন্মাদনার ঈষন্মাত্র অপসারণে উভয় পক্ষ চক্ষু মেলিয়া সহসা ভীষণ রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। যাহা দেখিল, তাহা হৃদয়বিদারণ লোমহর্ষণ ভীষণ দৃশ্য! ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া, স্তুপের পর স্তুপাকারে, কোথাও পর্ব্বতাকারে অশ্ব পদাতিক অশ্বারোহীর রক্তমণ্ডিত অসংখ্য মৃতদেহ; রণভূমি মনুষ্য-রক্তে ও শবে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। ওঃ!—কি প্রলয় তাণ্ডবময় মহাশ্মশান! সেই নারকীয় দৃশ্য চাক্ষুষ দেখিয়া উভয় সৈন্য সম্মুখ যুদ্ধ বিস্মৃত হইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উত্থিত তরবারি স্থির হইল। গুলীভরা বন্দুক নিস্তব্ধ হইল। এই সঙ্কটময় অবস্থার প্রতি-মুহূর্ত্তে বন্দী হইবার আশঙ্কা করিয়া এবং ঔরঙ্গজেব হস্তে অশেষ নিগ্রহের কল্পনা করিয়া পুত্র সহ দারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সিন্ধুদেশাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। দারাকে পলাইতে দেখিয়া বিপক্ষ সৈন্য জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। দারার বিপুলবাহিনী রণে ভঙ্গ দিল।

শ্যামগড়ের ডায়লগুই ঔরঙ্গজেবের দিল্লীর সিংহাসন লাভ। জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া ঔরঙ্গজেব ভ্রাতা মুরাদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া বারংবার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। মুরাদও সম্রাট্-গর্ব্বে ও বীরত্ব-গৌরবে আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য-গীত-মদিরা প্রমত্ত হইয়া বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইলেন। ঔরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতক কালী-উল্লাকে পরম সমাদরে সসম্মানে পুরস্কৃত করিলেন।

সপ্তম লহরী।

পুনরভ্যুদয়ে শাহজাদা সুজা।

বারাণসীযুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত, ও বিতাড়িত হইয়া, বীরবর সুজার আত্মাভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন, সে অপমানে তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। ভগ্নসৈন্য লইয়া, যুদ্ধাভিযানে সম্পূর্ণ বিদ্ধস্ত হইয়া, বিষণ্ণ-মুখে উন্নত মস্তক অবনত করিয়া, সুজা রাজধানী রাজমহলে প্রবেশ করিলেন। দীপাবলী তেজে উদ্ভাসিত, রূপের লহরে স্পন্দিত, সঙ্গীতঝঙ্কার-মুখরিত, আনন্দস্রোত-প্রবাহিত রাজমহলের রঙ্গমহল যেন পরাজয়-প্রভাবে নিষ্প্রভ হইয়াছিল। সুজার পদার্পণে সে ভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না, বরং ম্লানে গম্ভীরে মিশিয়া, মেঘাড়ম্বরপূর্ণ আকাশের গাম্ভীর্য্যপ্রহেলিকার সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে ঘনঘটার ঘোর দেখিয়া, সভাসদ্-সেনানীগণ অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের আশঙ্কায় মহা চিন্তাকুল হইলেন।

শান্তি-নিকেতন বঙ্গে আবার শান্তি বিরাজিত হইবে, না বিদ্রোহের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আবার দ্বিগুণতর তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, এই সমস্যার মীমাংসায় সকলেই ব্যাকুল,—সাহান্‌সা সুজাও তাহার সমাধান করিতে পারেন নাই। পরাজয়ের অবসাদে তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রতিভা সমস্তই প্রভাহীন হইয়া পড়িল। তিনি প্রায়ই উদাস-নয়নে অন্যমনস্ক; বিলাস-পরায়ণতা ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে অতি দূরে অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার বীরত্ব যখন এরূপ অবসাদে নিপীড়িত, সেই সময়ে একদিন তাঁহার প্রিয়তমা বেগম প্যারীবানু তাঁহার মানসিক অবসন্নতা উপলব্ধি করিয়া, নানাপ্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। সেই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে যেন কোন্ মৃতসঞ্জীবনী শক্তিপ্রভাবে শাহজাদা সুজা দীপ্ত বীরত্বে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনই মন্ত্রণাসভা আহূত হইল, সেই সভায় তিনি সেনানীগণকে একত্রিত করিয়া, বীরশোণিতসঞ্চালিনী, অতি তেজস্বিনী, হৃদয়গ্রাহিনী এক বক্তৃতা করিলেন; সে বক্তৃতাচ্ছটা জ্বালাময়ী।

তাহাতে সুযুক্তিপ্রয়োগ যতদূর না থাকুক বীরত্বের—গর্ব্বের প্রভা যথেষ্ট ছিল। প্রবীণ মন্ত্রিগণ বার্দ্ধক্যোচিত সুযুক্তি দেখাইয়া, সুজাকে যুদ্ধাভিযানে নিষেধ করিলেন। সেনানীবৃন্দ বলদর্পিত হইয়া, অসি স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিল, "শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে আমরা এবার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিব না।"

আশুপ্রত্যয়ী সুজা সদম্ভে বলিলেন, "এবার দিল্লীর বিপুল বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সঙ্ঘর্ষ নহে, তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া সিন্ধুপারে যাইতেছে। এবার সেই বালক মুরাদ, আর ফকির ঔরঙ্গজেবের সহিত আমাদের যুদ্ধ। এবার আমাদের জয় সুনিশ্চিত। বিপক্ষবাহিনী যদি আল্লার অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হয়, তথাপিও আমার বিপুল বাহিনীর অতুল বিক্রম সহ্য করিতে পারিবে না।"

তখনই সমর-আজ্ঞা প্রচারিত হইল। উন্নত-পতাকামূলে সৈন্য সমবেত আরম্ভ হইল। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের রাজা ও ভূস্বামিগণ নিয়মমত সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিন দিন মধ্যে রণদুর্ম্মদ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর বাহিনী সজ্জিত করিয়া, সাহান্‌সা সুজা আবার দিল্লীর পথে যুদ্ধাভিযান করিলেন।

রাজপুত-বীরেন্দ্র যশোবন্ত সিংহ উজ্জয়িনীতে কাসেম খাঁর বিশ্বাসঘাতকায় পরাজিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়া ছিলেন, পাঠকের সে কথা স্মরণ আছে। বীরবর যশোবন্ত সিংহের তেজস্বিনী মহিষী রাজপুত-গৌরব রাণার কন্যা মহা গৌরবিনী, বীর্য্যবতী, বীরাঙ্গনা। যোধপুরমহিষী স্বামীর রণস্থল হইতে পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আত্মাভিমানে জ্বলিয়া উঠিলেন ;—লাঞ্ছিত ক্লান্ত স্বামীকে দুর্গে প্রবেশ করিতে না দিয়া, তোরণদ্বার অবরুদ্ধ করিলেন ; দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "কাপুরুষের জন্য যোধপুর-দুর্গ নির্ম্মিত হয় নাই। আমার স্বামী সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, রাজপুত নামে কালী দিয়া, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া, শৃগালের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ কথা শুনিবার অপেক্ষা—প্রবলবিক্রমে সম্মুখসংগ্রামে আমার স্বামী প্রাণাহুতি দিয়াছেন, এ কথা শুনিলে সে বৈধব্য আমার অনেক সুখের বোধ হইত।"

বীরাঙ্গনার ধিক্কারে মর্ম্মাহত হইয়া যশোবন্ত সিংহ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু রণরঙ্গিণী রাজ্ঞী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার স্বামী যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কাপুরুষ! আমার

স্বামীর ছদ্মবেশে আমাকে ছলিতে আসিয়াছ? আমি রাজপুতবালা, কাপুরুষকে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা—অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া শান্তিলাভ করিব।"

এ লাঞ্ছনা যশোবন্ত সিংহ সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রচণ্ড-বিক্রমে আত্মোৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পুনর্ব্বার রাজপুতসৈন্য সম্মিলিত করিয়া, তিনি বীরত্বের কীর্ত্তি রাখিবার জন্য আবার মোগলবিদ্রোহে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞীর তিরস্কার বাক্যে তাঁহার মর্ম্মে শেলাঘাত হইয়াছিল; শিরায় শিরায় শোণিত-প্রবাহ দ্বিগুণতর বেগে ছুটিতেছিল। রাজপুত যোদ্ধৃগণের শরীরেও উত্তম সঞ্চারিত হইতেছিল। যশোবন্ত সিংহ সৈন্যগণকে পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়া উদ্দীপিত করিতেছিলেন। বীরতেজে কয়েক দিনের মধ্যে সসৈন্যে আগরায় উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে রাজা যশোবন্ত সিংহ যুগপৎ বিস্ময়ে ও ক্ষোভে আপ্লুত হইলেন। দেখিলেন, দারা বিধ্বস্ত, পলায়িত; ঔরঙ্গজেব বিজয়ী। অচিরেই ভারতের রাজধানী দিল্লীর অধীশ্বর হইবেন! কূটনীতিজ্ঞ ঔরঙ্গজেবকে তিনি সর্পসদৃশ ভয় করিতেন। একদিন যাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহারই সৌভাগ্য দেখিয়া তিনি ক্ষোভিত ও বিস্মিত হইলেন। অথচ ঔরঙ্গজেবের বিপুল বাহিনীর সহিত এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইতে হইবে বুঝিয়া, তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আগরার উপকণ্ঠে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, বঙ্গদেশ হইতে সুজা দ্বিতীয়বার অভিযান করিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার আশা হইল; সুজার সম্মিলনে ঔরঙ্গজেবের উচ্ছেদ করিয়া, ভারত-সিংহাসনের ভাগ্য বিধান করিবেন, সাম্রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা হইবেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়। ঔরঙ্গজেবের মিত্রবেশে একটি পরম শত্রু আগরায় আসিল।

অষ্টম লহরী

—০—

মুরাদের পরিণাম।

শ্যামগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজয় করিয়া, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ সসৈন্যে মথুরা পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; বিজয় গৌরবে শ্যামগড়ের নামকরণ করিলেন, "ফতেবাদ।"

সে দিন মথুরার শিবিরে আবার আনন্দের তুফান ছুটিল! ঔরঙ্গজেব সর্ব্ব-সৈন্যের সম্মুখে সবিস্ময়ে বারংবার মুরাদকে সম্রাট বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন; সামান্য সভাসদের ন্যায় আভূমি অবনত হইয়া, যুগলহস্তে বারংবার সেলাম দিলেন। আত্মগৌরবে স্ফীত মুরাদ সম্রাটের কল্পনা মনে জাগাইয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন! গৌরব-মদিরার অহমিকায় তিনি আজ আত্মহারা!

রণরঙ্গে ক্লান্ত মুরাদ আজ প্রাণ ভরিয়া রূপ-মদিরায় তৃপ্ত হইবার জন্য একটি নাচ মজলীসের আয়োজন করিলেন। রূপসীগণ যুদ্ধের কামান-গোলার অবিরত ভীষণ গর্জ্জনে কম্পিতা—সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িয়াছিল;—আজ গৌরবময় বিজয়-উৎসবে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইতে তাহারা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর ও উদ্দীপক সকল সামগ্রীই তথায় প্রচুর-পরিমাণে বর্ত্তমান। মদিরাবেশে স্খলিতবসনে সূক্ষ্ম আবরণ হইতে অঙ্গরাগ বিকাশ করিয়া সুন্দরীগণ যেন পদ্মবনে মলয়-সঞ্চালিত, তরঙ্গ-হিল্লোলে স্পন্দিত হংসী-যুথের মত নাচিতেছেন। সেই বিলাস-সরোবরে কমলিনীদল বেষ্টিত রাজহংসের মত রসরাজ মুরাদ আনন্দে—অধীরে পুলকিত হইতেছেন।

মরি! মরি! কি সুন্দর,—ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর, সৌরভ-মাধুরী-বিচ্ছুরিত আনন্দের তুমুল রঙ্গ ছুটিতেছে! স্ফাটিক সামাদানে কি স্নিগ্ধ আমোদপূর্ণ দীপ-মালা ভাতি বিকীর্ণ করিতেছে! স্তূপের পর স্তূপাকারে পুষ্পরাশির কি পরিমল গন্ধমদির অমিয় সৌরভ বায়ুর তরঙ্গে খেলিতেছে! সর্ব্বোপরি সুগন্ধ-স্নাতা বিলাসিনীগণের রত্নালঙ্কারের দীপ্তিতে,—চারুহাসিনীগণের আড়নয়নের

বঙ্কিম কটাক্ষে, চতুর্দ্দিক বিভাসিত; ফুল্লারবিন্দ সদৃশী প্রফুল্লমুখের মধুর মুচ্‌কি হাসিতে নৃত্যসভায় কি চমৎকার বিজলীর তরঙ্গই ছুটিতেছে! প্রেমোন্মত্ত শাহাজাদার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিমুগ্ধ হইতেছে, চক্ষের নিকট ফুল্লমুখীদের হাস্যময়ী মধুরমূর্ত্তি হাসিতেছে।

বিলাসিনীগণ আজ বিচিত্র ভূষণে,—সূক্ষ্মবসনে,—মনোমদ ভাবে সুসজ্জিতা। আজ তাহারা মুরাদের নিকট প্রেমাদরে পুরস্কৃতা হইবে। কাহারও পীনোন্নত পয়োধরযুগল অনাবৃত—কেবল ফুলহারে আচ্ছাদিত; সূক্ষ্ম পেশোয়াজে ক্ষীণ কটিতট সুশোভিত; মেদিরাগরক্ত সুন্দর পদে সোনার নূপুর যেন তালে তালে ঝঙ্কার দিয়া অধীরভাবে প্রেমিককে ডাকিতেছে! কোন মনোমোহিনীর সুচিকণ নীলবাস ফুটিয়া বর্ণপ্রভা বাহির হইতেছে, যেন নীলাম্বুবক্ষে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে! কোন সুকেশিনীর কুঞ্চিত অলকদাম ললাটে—কর্ণপার্শ্বে, গ্রীবা-প্রান্তে—বিন্যস্ত হইয়া, প্রফুল্ল মুখখানিকে যেন মৃণালদলে আবদ্ধ করিয়া,চোখের বিজলীতে হীরকপ্রভা পরাজিত করিতেছে। কোনও শ্যামাঙ্গী মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া, কর্ণকুণ্ডলের রত্নের দীপ্তির সহিত সমভাতিতে হাসিয়া, চাঁদধরা ফাঁদ পাতিতেছে। কোন শ্যামাঙ্গী কালো কেশের রাশিতে চাঁদের হাসির মত হীরার হার পরিয়াছেন, কোন সুন্দরী কুঞ্চিত কেশদামে বেণী বিনাইয়া কেহ বা অলকা উড়াইয়া, মরালনিন্দিত ভঙ্গীতে হাসিয়া হাসিয়া মুরাদের সহিত গল্প করিতেছে; কর্ণকুণ্ডলের হীরকভাতির সহিত মুরাদের ঔৎসুক্য বেশ মিলিতেছে। কোনও পূর্ণলাবণ্যময়ী সতৃষ্ণদৃষ্টিতে মুরাদের দিকে চাহিয়া, হেমপাত্রে সুরাধারা ঢালিতেছে। মুরাদ আকণ্ঠ পুরিয়া সেই সুরাস্বাদে প্রমত্ত হইতেছেন।

সুন্দরীগণ সকলেই রত্ন-ভূষণের উপর পুষ্পাভরণা। ফুলরাণী সাজিয়া, ফুলের হাসি হাসিয়া, ফুলশরের সন্ধান করিয়া,—কেশদামে ফুলের মালা জড়াইয়া,—সুকোমলকণ্ঠে পুষ্পমালিকার স্নিগ্ধ প্রভা বিকাশ করিয়া, কেহ ফুলের পাখায় হাওয়া খাইতে খাইতে, কেহ পুষ্পগুচ্ছ হইতে ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে নাচিতেছে। পুষ্পের সৌরভে-সিঞ্চিত সৌরভবারির সুগন্ধে—গন্ধদীপের সৌরভে—গন্ধামোদিত বিলাসিনীগণের অঙ্গের সৌরভে—শিবিরের বায়ুমণ্ডল সৌরভময়।

সুন্দরীগণ হাবভাব-কটাক্ষ ভুবনমোহিনী। সুধাপ্রভাবে প্রমত্ত মুরাদ উন্মত্ত। রঙ্গিনীগণ সপ্তসুরসম্মিলিত সুমধুর বীণাদি যন্ত্রে শিবির প্রতিধ্বনিত

করিয়া, ততোধিক সুমধুর পরিমলবর্ষী রমণীকণ্ঠের সহিত ঐক্যতানে মিলন করিতেছে। তান-লয় মিলাইয়া,—নূপুরের প্রেমবিনোদন মৃদুমন্দ ভাবে বাদ্য-ঝঙ্কারকে পরাভূত করিয়া, অলঙ্কার-শিঞ্জিনীতে মনোমোহন করিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিমায় নাচিতেছে। আর সোমে সোমে মুরাদকে কটাক্ষসম্পাত করিতেছে। মরি, কি মধুর তান! কি প্রাণমনোহারী সুর! কি সুধাবর্ষি ধ্বনি! কি সোহাগ-আবেগে অধীর লয়! কি চিত্তবিনোদন আদিরস সঙ্গীত!

এই সুধামাখা হাসি-চাহনির লহরীর সহিত সিরাজী মদের ফোয়ারা প্রবলবেগে ছুটিতেছে। প্রত্যেক সুন্দরীর হস্তেই সুরাপাত্র। সুধা লালসার ক্রীতদাস মুরাদ প্রত্যেক সুন্দরীর পাত্র হইতে এক এক চুমুক মদ লইয়া, প্রত্যেককে আলিঙ্গন ও চুম্বনে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। উগ্র মোহন মাদকতায় বিহ্বল হইয়া, মুরাদ ক্রমে মোহাভিভূত হইলেন, তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়া আসিল। মদিরারক্ত উদ্‌ভ্রান্ত-নয়নে তিনি সুন্দরীদের নৃত্যরঙ্গ দেখিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতর অনুভূতির সঞ্চার নাই।

সমবেত নৃত্যরঙ্গ সমাপ্ত হইলে, বিশেষ নৃত্য আরম্ভ হইল। দুইটি রঙ্গিণী মদিরাপাত্র-হস্তে উলঙ্গবাহার দেখাইতে দেখাইতে নৃত্য করিতে লাগিল। লাজচ্ছটা-বিকশিত রক্তিম গণ্ডে, বিজলী-তরঙ্গিত প্রেম-উদ্ভাসিত নয়নে, মধুর হাস্যরঞ্জিত অধরে চুম্বনদানের জন্য ব্যগ্র হইয়া,মুরাদ স্খলিত চরণে গিয়া,সুন্দরী-দ্বয়কে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন, অবিরত চুম্বনদানে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাকে রূপোল্লাসে ব্যস্ত হইতে দেখিয়া, অন্য রূপসীরা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। চারুহাসিনীগণের চাঁদধরা মোহন ফাঁদে ধরা পড়িয়াছেন দেখিয়া, তিনি রঙ্গিণীদ্বয়কে লইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। অকস্মাৎ সেই সময় রমণীবেশে সজ্জিত চারি জন প্রহরী সেই রূপপ্রভাময় রঙ্গ-কক্ষে প্রবেশ করিল; অতি ধীরে আলিঙ্গনবদ্ধ মুরাদের হস্ত-পদ রেশমী রুমালে আবদ্ধ করিল। কোথাকার প্রহরী? এতক্ষণ যাহারা মুরাদের মুগ্ধচিত্তের প্রহরীতা করিতেছিল সেই সকল বিলাসিনীর মধ্যে রমণীবেশে সজ্জিত চারিজন প্রহরী!

মুরাদ মনে করিলেন,রঙ্গিণীরা রঙ্গ করিতেছে। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া তখনও রসভৃঙ্গরাজের মত অধরসুধাপানে রত। প্রহরী চতুষ্টয় রুমালে হস্তপদ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রমত্ত মুরাদকে রঙ্গকক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। সেই বন্ধন অবস্থায় তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া, সেলিমগড়ের পথে প্রেরণ করা হইল। সেই

সময়ে সেলিমগড়ের পথে আরও তিনটি সুসজ্জিত হস্তী প্রেরিত হইল। পাছে মুরাদের সৈন্যগণ রক্ষীসৈন্যগণকে বধ করিয়া, তাহার উদ্ধারসাধন করে, এইজন্যই এইরূপ সাবধানতা। কূটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেব কৌশলনীতিতে পরিপক্ক ছিলেন; সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে তিনি, চারিদিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, কৌশলজাল বিস্তার করিতে পারিতেন,এই জন্যই তাঁহার কৌশলজালের কোন সূত্র কখনও ছিন্ন হইত না, অভীষ্ট সিদ্ধ হইত-ই-হইত। মুরাদকে বন্দী করিয়া বিজয়ী ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে গোয়ালিয়র-দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। সঙ্গে রহিল কেবল মুরাদের প্রিয়তমা উপপত্নী সমরুলবাঈ। রাজনীতিজ্ঞ ঔরঙ্গজেব মুরাদের রঙ্গিনীগণকে কার্য্যোদ্ধারের জন্য যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

নবম লহরী।

নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে।

ঔরঙ্গজেব ফকিরি গ্রহণ, মক্কা প্রয়াণ ও ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগের ভাণ সুকৌশলে অপসারিত করিয়া, অকুতোভয়ে নিজে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মুরাদকে বন্দী করিয়া, মথুরা হইতে আগ্রায় ফিরিয়া, তিনি অতুলনীয় ইন্দ্রপুরী তুল্য আগ্রার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সকলেই বিতাড়িত, প্রহরিগণ কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। প্রাসাদের সম্মুখ-চত্বরে প্রকাণ্ড শিবিরে মুরাদ ও ঔরঙ্গজেবের উভয়পক্ষীয় বিজয়ী সৈন্যগণ বীরদর্পে অবস্থান করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র বীরবর মহম্মদকে কতিপয় অতি বিশ্বস্ত সৈনিক সহ রঙমহলে প্রেরণ করিলেন।

বৃদ্ধ সম্রাট্ শাজাহান সেই সময় মহলের গবাক্ষ দিয়া, প্রিয়তমা বেগম মমতাজের প্রেমস্মৃতির পুণ্যময় মন্দির তাজমহল দর্শন করিয়া, অশ্রু প্রবাহে ভাসিতে-ছিলেন। সহসা তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী শাহজাদী জাহানারা আসিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া সংবাদ দিলেন, 'বিজয়ী ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে আগ্রার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন, শীঘ্রই রংমহলে প্রবেশ করিবেন। এ সংবাদে বৃদ্ধ শাজাহান বিন্দু-মাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি জানিতেন, ঔরঙ্গজেব তাঁহার উপযুক্ত বীরপুত্র, কিন্তু তাঁহার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া, নিজে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, ভারতে মুসলমান-ধর্ম্মের বিজয়ধ্বজা উড়াইবেন, ইহাই ঔরঙ্গজেবের আন্তরিক উদ্দেশ্য নানা আবরণে প্রচ্ছন্ন হইলেও এ ভাব এখন পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শাহাজাদীর কল্পিত ভয় কার্য্যে পরিণত হইল। শাহ-জাদা মহম্মদ সেনাগণকে লইয়া সম্রাট্ শাজাহানের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঔরঙ্গজেবের হুকুমনামা দেখাইয়া "সম্রাট্ শাজাহান বন্দী" একথা তাঁহাকে শুনাইলেন। আরও বলিলেন, "আপনার শরীর দুর্ব্বল, এ শরীর কঠোর রাজকার্য্যের অযোগ্য, দারা বিধর্ম্মী, সুজা বিলাসী, মোরাদ মাতাল এই জন্যই আমার পিতা স্বধর্ম্মরক্ষার্থ সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। আপনি তাঁহাকে সে অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি তরবারির

সাহায্যে নিজ ন্যায্য অধিকার হস্তগত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তজ্জন্য আপনি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইবেন না, বরং উক্ত কার্য্য আপনার অনভিপ্রেত হইবে না, ইহা তিনি আশা করেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, আপনি কিছু দিন এই রঙ্গমহলের সীমানার মধ্যে বিশ্রাম করিয়া আপনার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্গঠিত করেন। এ বিষয়ে আপনার আদেশ তাঁহার শিরোধার্য্য। বিরাট্ মোগল-সাম্রাজ্য শাসনের গুরুভার হইতে কিছু দিন আপনাকে অবসর দিয়া পিতৃদেব আপনার মহামূল্য জীবনের শেষভাগ নির্ব্বাধ-ভাবে ধর্ম্মচর্চ্চায় কাটাইবার সুযোগ আপনাকে দিতেছেন। এই বিশালরাজ্য-শাসনের সকল প্রকার আয়াস, উদ্বেগ, অশান্তি এবং ক্লেশ কেবলমাত্র আপনার শ্রীচরণে ঐকান্তিকী ভক্তি রাখিয়া, পিতৃদেব একাকী বহন করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন। তিনি বিনীতভাবে আপনার নিকট নিবেদন করিয়াছেন, 'যুবরাজ দারা স্বধর্ম্মে আস্থাহীন এবং দাম্ভিক ; অবিমৃশ্যকারিতার ফলে তিনি রণে পরা-জিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। শাহাজাদা সুজা ভোগী ও হঠকারী, তিনি পরিণামচিন্তার অভাববশতঃ হঠকারিতা দেখাইতে গিয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া-ছেন। বাদশাহজাদা মুরাদ বারাঙ্গনা ও সুরার সেবায় জীবন পণ করায় এক্ষণে শালিমগড় দুর্গের নিভৃত কক্ষে বিলাসতরঙ্গে নিমগ্ন। এ ক্ষেত্রে আপনার বিবেচ-নায় মোগল-সাম্রাজ্যের গুরুভারবহনে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অকাতর শ্রমপরা-য়ণ, মহোৎসাহী, কূটনীতিজ্ঞ, প্রবলপ্রতাপ এবং বীরাগ্রগণ্য আপনার তৃতীয় কুমার দাক্ষিণাত্যবিজয়ী পিতৃদেব শাহজাদা ঔরঙ্গজেবই যে আপনার বিবেচনায় একমাত্র সুযোগ্য পাত্র বিবেচিত হইবেন, তাহাতে তিনি অণুমাত্র সন্দেহ করেন না। সেই সন্দেহ করেন না বলিয়াই যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে তিলমাত্র অবহেলা করেন নাই।—এই কর্ত্তব্যপালন জন্য অবশ্য তিনি চির-দিনই আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদভাজন হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, ইহাও তাঁহার আশা। তাঁহার যাহা যাহা নিবেদ্য ছিল, জাঁহাপনার রাজশ্রী-সন্নিধানে সমুদায়ই নিবেদন করিলাম। আপনার অবসরমত এই বিষয়ে আদেশ পিতৃ-সন্নিধানে যে নিশ্চয়ই প্রেরিত হইবে, তাহা তিনি বিদিত আছেন। এক্ষণে জাঁহাপনার শ্রীচরণ-কমলে এই দাসানুদাসের সহস্র সহস্র কুর্ণীশ নিবেদন করিতেছি।" এইরূপ বক্তৃতার পর যুবরাজ মহম্মদ পিতামহের নিকট বিদায় লইলেন। পাছে সাজাহান তাঁহাকে তিরস্কার করেন, এই আশঙ্কায় উত্তরের অপেক্ষামাত্র করিলেন না।

মহম্মদ চলিয়া গেলে সাজাহান কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী রাজকুমারী জাঁহানারাকে বলিলেন—"জাঁহানারা, তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়। এই চাতুর্য্য, প্রবঞ্চনা এবং কপটতা-পূর্ণ বাগ্‌জালের অন্তরালে নানা ভীষণ সংবাদ লুক্কায়িত আছে। সরল কথায় বুঝিতে হইলে এই লম্বা বক্তৃতায় স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে যে, ঔরঙ্গজেবের কোনও চাতুরীতে দারার প্রবল বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু কেন এমন হইল? দারার বিশ্বস্ত রাজপুত সেনাপতিগণ ত উৎকোচের বশীভূত হইবে না। একমাত্র ফেরেবরাজ কালীউল্লাকে আমার সন্দেহ। সেই বোধ হয়, প্রথমেই রণে ভঙ্গ দিয়াছিল। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, কাসেম খাঁর প্রতারণায় যশোবন্তসিংহ পরাজিত হন; তাহাতেই দারার বিপদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এবারকার পরাজয় নিশ্চয়ই কালীউল্লার দ্বারাই ঘটিয়াছে। কাসেম ও কালীউল্লাই দারার সর্ব্বনাশ করিল। দারা যখন পলায়িত, তখন তাহার বিপদের আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব জীবিত প্রতিদ্বন্দ্বী কখনও ভালবাসে না। দারা জীবিত থাকিতে ঔরঙ্গজেব তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, কদাচ এরূপ আশা করিও না। এখন আমাদের অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, একবার বুঝিয়া লও। আমি পীড়িত ও দুর্ব্বল। আগ্রার সৈন্যবল এখন ঔরঙ্গজেবের আয়ত্তাধীন নহে, এ কথা বলিতে পার না। ওদিকে মুরাদ শঠতায় পরাজিত বা কৌশলক্রমে হস্তগত হইয়া শালিমগড়ের দুর্গে বন্দীকৃত। সম্ভবতঃ মত্তাবস্থায় তাহাকে বন্দী করিয়াছে; নতুবা জীবিতদেহে সে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহে। সুজার সেনাপতিগণকে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া বোধ হয়, সুজাকে ঔরঙ্গজেব পরাভূত করিয়াছে; কারণ, সুজার রণ-নৈপুণ্য, বীরত্ব ও সাহস পরাজয়ের মুখ দেখিতে প্রস্তুত নহে। চারিদিকের পথ পরিষ্কার করিয়া নিজ সৈন্য সহ মুরাদের সৈন্য মিলিত করিয়া সম্ভবতঃ ঔরঙ্গজেব আগ্রার রক্ষিবাহিনীকে কোনও না কোনও কৌশলে আয়ত্ত করিয়াছে। এ স্থলে আমাদের আর প্রকাশ্য বিরোধের উপায় নাই। সুজা পুনরায় সৈন্যসংগ্রহে বোধ হয় ব্যস্ত। মুরাদ কারাগারের বাহিরে জীবিতাবস্থায় যে কখনও আসিবে, আমার আর বিশ্বাস হয় না। এখন ঔরঙ্গজেবের কার্য্যে মৌখিক অনুমোদন করিয়া, তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। তাহার সন্দেহ কতক পরিমাণে তিরোহিত হইলে, সুযোগক্রমে দারার সাহায্য জন্য সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে। দারা প্রবল হইলে, এই চক্রি-চূড়ামণিকে পরাভূত করিয়া আমাদের উদ্ধারসাধন করিতে পারিবে। নতুবা গত্যন্তর দেখিতেছি না। তোমার এ বিষয়ে পরামর্শ কি?"

সাহজাদী জাঁহানারা এতক্ষণ বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন শুনিয়া সেই "তন্বীর নীলনলিনী সম লোচনদ্বয়" ক্রমে "কোকনদরুচি" ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে শাহজাদীর সেই সিরাজী-দীপ্ত গোলাপী গণ্ডের অরুণিমা বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নয়নদ্বয় হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, মনস্তাপে গণ্ডদ্বয় শিশির-সিক্ত বিকচ কমলের শোভা ধারণ করিল। রাজকুমারী কুন্দবিনিন্দিত দন্তপাঁতি দ্বারা অধর দংশন করিয়া বহুকষ্টে পুনরায় আত্মসংবরণ করিলেন। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাহজাদী বলিলেন—"জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমাদের এখন আর স্পষ্ট বিরোধ সাজে না। এখন রোশেনারার দৌত্য অবলম্বন করিয়া এই চক্রীর চক্রজাল ছেদ করিতে হইবে। কিন্তু ব্যাপারটা একবার ভাবিয়া দেখুন! পিতার পীড়ার অবসর গ্রহণ করিয়া এই সয়তান কিরূপে "মক্কা শরিফে গমন করিয়া ফকিরী" লইয়াছে, এইবার বুঝিলেন? জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবপ্রতিম উদারহৃদয় প্রেমিক ও ভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানী দারাকে কি প্রতারণার কৌশলে দুইবার রণে পরাজিত করিয়া এখন তাহার জীবননাশের চেষ্টায় এই পামর প্রাণপণ করিয়াছে, তাহা ত আপনার আর বুঝিতে বাকী নাই। সেই প্রতারণাপূর্ণ কূটনীতির কৌশলে ঔরঙ্গজেব বীরবর সুজা ও মুরাদকে সিংহাসন হইতে সুদূরে অপসারিত করিয়াছে, তাহাও বুঝিলেন। পাছে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিলে ক্ষিপ্তা ব্যাঘ্রিণীসমা তাতারিণীগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হয়, সেই ভয়ে স্বয়ং না আসিয়া দূতস্বরূপ মহম্মদকে পাঠাইয়াছে। আপনার নিকট দূত কখনও বধ্য নহে, এ কথা সেই ধূর্ত্ত যথেষ্ট অবগত আছে। নতুবা আমার সমক্ষে আপনার অবরোধ আদেশ মুরাদ কখনও কি প্রচার করিতে সাহসী হইত? কি বলিব প্রভু, আল্লা আমাকে নারী করিয়াছেন, নতুবা এই অস্বাভাবিক ভ্রাতৃদ্রোহিতা, পিতৃদ্রোহিতা এবং রাজদ্রোহিতার সমুচিত প্রতিফল একবার দেখাইয়া দিতাম।" জাঁহাপনা পুনরায় অধর দংশন করিয়া আত্মসংবরণ করিলেন। সেই পিতৃপ্রাণা রাজকুমারীর মর্ম্মপীড়া সাহজাঁহার অবিদিত ছিল না; সম্রাট্ ধীরে ধীরে কুমারীর দক্ষিণ হস্তটি নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া বড়ই স্নেহে, বড়ই আদরে নিজের হস্তে রাখিয়া সেই মূর্ত্তিমতী তেজস্বিতা, রাজভক্তি ও প্রতিভার দিকে নির্নিমেষনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন। পরে অতি কোমল অথচ সস্নেহ বচনে বলিলেন, "জাঁহনারা ভগবান্ যে সৌভাগ্য আমাকে দিলে কি আর এই বয়সে এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়? দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও

মুরাদ আমার এই চারিটি পুত্রই দোষে গুণে গঠিত। সম্রাট্‌প্রবর পুণ্যকীর্ত্তি আকবরের ন্যায় সকল দিক্ সামলাইয়া, সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় শক্তির সামঞ্জস্যে রাজ্যপরিচালন করিবার সামর্থ্য ইহাদের কাহারও নাই। সেই শক্তি আল্লা তোমাতে কিছু পরিমাণে দিয়াছেন; কিন্তু তোমার পিতামহী নুরজাঁহার স্নেহান্ধতা যদি তোমাতে না থাকিত, তোমাকে পুত্ররূপে পাইলে আমি বড়ই সুখী হইতাম। দেখ, আমার প্রতি অনুরাগাধিক্যে তুমি অনেক সময় ক্রোধে, ক্ষোভে, অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বীয় যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া ফেল; ইহাতে রাজকার্য্যের ক্ষতি হইয়া বসে। জানিও, এই গৃহভিত্তিরও কর্ণ আছে, ঔরঙ্গজেবভক্ত রাজকুমারী রোশেনারার চক্ষু তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে—সংযত হইয়া কার্য্য কর। সম্রাটের ক্রোধের অবসর নাই, জানিও। যাহা হউক, এখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। স্থির ও সংযতচিত্তে কঠোর কর্ত্তব্যসাধন কর। ভাবুকতাকে স্থান দিও না। ঔরঙ্গজেবের কার্য্যে অনুমোদন করিয়া তাহাকে খেলাৎ ও উপঢৌকন রোশেনারার দ্বারা পাঠাইতে হইবে। এ বিষয়ে খাস দরবারে পরামর্শ করা যাইবে। আম-দরবারে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই।" জাঁহানারা হাসিয়া বলিলেন, "মহম্মদ গমন করিলে পর জাঁহাপনা যে সম্পূর্ণ আত্মসংবরণ করিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ দাসীর তাহা স্মরণ হয় না।" সাজাহান কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাস দরবারে রাজকুমারীর সহিত বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। পরে রোশেনারাকে ডাকিয়া দৌত্যভারার্পণ করিলেন।

একাদশ লহরী



বিজয়ীর শিবিরে।

ত্রিযামার শেষ যাম এখনও অতীত হয় নাই। আগ্রার রাজপ্রাসাদের তোরণ-দ্বারে কৃষ্ণবসনা তিনটি সুন্দরী আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে একশত প্রহরী কৃষ্ণবসনে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে আবৃতবদন ও আবৃতদেহ প্রথমা সুন্দরী বস্ত্রাভ্যন্তরাল হইতে একটি পাঞ্জা বাহির করিয়া তোরণস্থিত প্রহরীকে দেখাইবামাত্র সসম্ভ্রমে সে দ্বার ছাড়িয়া দিল। একশত তিনটি কৃষ্ণা মূর্ত্তি সেই মসীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান একশত তিনটি কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকে আরোহণ করিল। নিমেষমধ্যে অশ্ব ও আরোহী উভয়ের মূর্ত্তিই অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হইল।

আগ্রার বাহিরে মিলিত সৈন্যের সুশৃঙ্খল-সন্নিবিষ্ট শিবিররাজীতে বিজয়ী সৈন্য-বৃন্দের আনন্দোচ্ছ্বাস এখনও প্রশমিত হয় নাই। কোনও কোনও শিবিরে এখন হাস্য ও গীতের রোল বিলক্ষণ শুনা যাইতেছিল। এই সকল শিবির-চক্রের বহু দূরে একাদশটি শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। তাহারই কেন্দ্রদেশীয় শিবিরের ভিতর শান্তি ও নিস্তব্ধতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। সেই শিবির বিজয়ী ঔরঙ্গজেবের। উহার দশদিকে দশজন প্রধান সেনাপতির শিবিরব্যূহ। তাহার চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ হাবশী রক্ষিবৃন্দ নগ্নতরবারি হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিঃশব্দে দ্রুতপদে সঞ্চরণ করিতেছিল। এই শিবির-রক্ষিদলের অধিনায়ক, হঠাৎ একটি অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। অমনি ছয় জন রক্ষী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কি যেন একটা অস্ফুট আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য-শিবিরব্যূহের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, পূর্ব্বোক্ত একশত তিনটি কৃষ্ণ-মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া রক্ষিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইল। —রক্ষিনায়ক তখন তিনটি অবগুণ্ঠনবতীকে সঙ্গে লইয়া ঔরংজেবের শিবিরে প্রবেশ করিল; দেখিল, সেই আদর্শ আনুষ্ঠানিক মুসলমান তখন সপ্তম নমাজে ব্যস্ত। সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া কৃষ্ণবসনা সুন্দরীত্রয়কে সেখানে রাখিয়া রক্ষিনায়ক নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করিল। নমাজ শেষ হইলে ঔরঙ্গজেব

বলিলেন "রোশেনারা, অদ্য পাঞ্জা চাহিয়াছিলে কেন ? ব্যাপারটা কি ?" শুনিবা-মাত্র রোশেনারা অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "বড়ই কঠিন। বাদশাহ ত জাঁহানারার সহিত বহু পরামর্শ করিয়া এই পত্র, এই তরবারি আর এই রত্নরাজী ভেট পাঠাইয়াছেন। রাজ্যপরিচালনে ঔরঙ্গজেবই যোগ্য ; তাহার প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার অনুমোদিত, এই সকল কথা জানাইয়া বাদশাহ তাঁহার প্রিয় (?) পুত্র আওরঙ্গজেবকে বহু আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এই ত বাহিক ব্যাপার ; ভিতরের কাণ্ডটা বিজেতা ঔরঙ্গজেবের বুঝিতে বিলম্ব হইবে কি ?"

ঔরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে রোশেনারার আদেশে অবগুণ্ঠনবতী সখীদ্বয় উপঢৌকন সকল সম্রাট্-সমক্ষে উপস্থিত করিয়া অভিবাদনানন্তর সসম্ভ্রমে শিবির ত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব সেই মণিমুক্তা-খচিত তরবারিটি হস্তে লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন—"আলমগীর" বা বিশ্ববিজেতা নামাঙ্কিত এ তরবারি যখন পিতৃদেব আমাকে দান করিয়াছেন, তখন আলমগীরই আমার বাদশাহী নাম হউক। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য, অদ্য হইতে ঔরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ হইল।" রত্নরাজী হইতে কিঞ্চিৎ রত্ন লইয়া ঔরঙ্গজেব চারি-দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "পিতৃদত্ত এই রত্ন স্পর্শে মোগল সাম্রাজ্য সর্ব্বত্র রত্নপ্রসূ হউক।" তৎপরে পিতার সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া সসম্ভ্রমে তাহা চুম্বন করিলেন। পত্রটি তখন স্বীয় উষ্ণীষে রক্ষিত করিয়া বলিলেন, "ইহাই আমার বাদশাহীর ফর্ম্মান।" রোশেনারা নিঃশব্দে এতক্ষণ এই প্রহসন দেখিতে-ছিলেন, এক্ষণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভাল, তাহার পর ? এ সকল কথা ত পিতৃদেবকে বলিতে হইবে। ঐরূপ চাতুরীপূর্ণ একটা উত্তর পিতৃদেবকে দিলে হয় না। পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া একটা উত্তর প্রদান ঔরঙ্গ-জেবের পক্ষে কতক্ষণের কার্য্য ? প্রায় রজনী প্রভাত হয়, অন্ধকার থাকিতে রাজবাটীতে ফিরিতে হইবে। পাঞ্জা আমার নিকট রহিল। আগামী কল্য আসিয়া পরামর্শ করিব। গতিকটা আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি। এই বহিন থাকিতে ঔরঙ্গজেবের কেশ স্পর্শ কেহ করিতে পারিবে না জানিও।" ঔরঙ্গজেব তখন ভগিনীর মস্তকে হস্ত দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "রোশেনারা, আমি আমি তোমার বুদ্ধিবলেই অদ্য বাদশাহী লাভ করিতে সক্ষম হইলাম। তুমি আগ্রায় না থাকিলে এই বিষম ষড়যন্ত্রের ঘুণাক্ষরও জানিতে পারিতাম না। সেই পিশাচিনী জাঁহানারার চেষ্টায় এত দিনে হয় ত ঔরঙ্গজেবের মস্তক

দারার অসির কৃপায় ভূ-চুম্বন করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু ভগিনী সাবধান! জাঁহানারা দৃপ্তসিংহিনী; তাহার নিকট সর্ব্বদা প্রাণ হস্তে করিয়া বাস করিতে হইবে, এ কথা স্মরণ রাখিও। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, ভগিনি, তোমার ঋণ কখনই ঔরঙ্গজেব শোধ করিতে পারিবে না জানিও।" তৎপরে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া রোশেনারা ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে পত্রোত্তর লইয়া অন্তঃপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

দ্বাদশ লহরী।

দারা ও সুজার অনুসন্ধানে।

সম্রাট্ শাহজাহান এক্ষণে বন্দিদশায় অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার নিকট গোপনে একটী পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি দারার সাহায্য জন্য সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিতে উক্ত শাসনকর্ত্তাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রোশেনারা এ সংবাদ গোপনে জানিতে পারিয়া যথাকালে ঔরঙ্গজেবকে বিদিত করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। তখন ঔরঙ্গজেব প্রকাশ্য-ভাবে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া আলমগীর পদবী গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পঞ্চনদের সৈন্যসাহায্যে তখন দারা আবার ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর সহিত আজমীরের পার্ব্বত্যপ্রদেশে চারিদিন ধরিয়া ঘোর রণ করিলেন; এবারেও রণে পরাভূত হইয়া স্বীয় পত্নী, কন্যা ও কতিপয় অনুচর সহ আহম্মদাবাদের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে অনুচরবর্গ তাঁহাদের ধনরত্নাদি হরণ করিয়া পলায়ন করিল। আহম্মদাবাদে আসিয়া দারা দেখিলেন, সহরের দ্বার রুদ্ধ। তথা হইতে নানাস্থানে হতাশভাবে ভ্রমণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের প্রেরিত দূতের হস্তে অবশেষে যুবরাজ দারা নিপতিত হইলেন। পথকষ্টে যুবরাজপত্নী অগ্রেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে আর শত্রুহস্তে লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। কন্যাকে পত্নীর শবদেহের সহিত লাহোরে প্রেরণ করিয়া দারা আত্ম-সমর্পণ করিলেন; তাঁহাকে তখন দিল্লীনগরীতে আনয়ন করা হইল। ধূলি-ধূসরিত দেহে ভিক্ষুকের বেশে তাঁহাকে একটি কদর্য্য হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগরীময় ভ্রমণ করান হইল। নগরবাসী ও নগরবাসিনীগণ দারার দুর্দ্দশা দর্শনে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অবশেষে সহরময় বিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া ঔরঙ্গজেব মোল্লাদিগের দ্বারা দারার বিধর্ম্মিত্ব প্রমাণ করিয়া শিরশ্ছেদের আদেশ প্রদান করাইলেন; সুতরাং সত্বরেই দারার ভবলীলা পরিসমাপ্ত হইল। দারার ছিন্নমুণ্ড ঔরঙ্গজেবের নিকট আনীত হইলে সেই চতুরচূড়ামণি কতই অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। দারার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমানও গোয়ালীয়রের দুর্গে আবদ্ধ ও ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও ধনরত্নাদি ধীরে ধীরে

সুকৌশলে অপসারিত হইল। এইরূপে দারার স্মৃতি বিলুপ্ত করিয়া সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব সুজার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

এ দিকে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুজা পুনরায় আগ্রার দিকে আসিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব সেনাপতি মীরজুমলা ও শাহজাদা মহম্মদকে সুজার বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। মীরজুমলার আধিপত্য মহম্মদের অসহ্য বোধ হওয়ায় রাজকুমার খুল্লতাতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া খুল্লতাতকুমারীর পাণিপীড়ন করিলেন। কিন্তু এই মিলিত সৈন্যও মীর জুমলার শিক্ষিত বাহিনীর সমকক্ষ হইল না। তিন সপ্তাহকালব্যাপী যুদ্ধের পর সুজা পরাস্ত হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ পুনরায় পিতার শরণাপন্ন হইলেও পিতা ঔরঙ্গজেব বিদ্রোহী পুত্রকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। কারাবাসেই মহম্মদের ভবকারাবাসের অবসান হইল; তাহাতেই তিনি স্বীয় পিতামহ শাহজাহানের কারাবাস-ব্যবস্থার মহা সন্তাপ হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

সুজা ব্রহ্মরাজের শরণাপন্ন হইলে পর মীর জুমলা অগত্যা বহু কষ্টে বঙ্গদেশে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ফিরিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করিয়া ঔরঙ্গজেবের তিরস্কার হইতে অব্যাহতি পাইলেন। এ দিকে সুজা ও কন্যা দুইটি লইয়া ব্রহ্মরাজের বিরাগভাজন হইলেন। সেই বিরাগের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইল। তাহা হইতেই সুজা ও তাঁহার কন্যাদ্বয়ের নাম জগতের নাট্যশালা হইতে চির-অপসৃত হইল। এইরূপে দারা ও সুজার চিহ্ন লোপ করিয়া ঔরঙ্গজেব মুরাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শেলিমগড় হইতে মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করা হয়। সেই দুর্গেই মুরাদের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা যবনিকার অন্তরালে; কেহই মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গের বাহিরে আসিতে দেখে নাই। কিছুদিন পরে হঠাৎ দুর্গ-কক্ষ হইতেও মুরাদের অন্তর্ধান লক্ষিত হইল। দুর্গের একটি সোপান-প্রস্তরের পরিবর্ত্তন ব্যতীত দুর্গের কোনই পরিবর্ত্তন কেহই দেখিতে পায় নাই। ইহাতেই দুর্গের রক্ষিগণ সেই সোপান-প্রস্তরে কখনই পদার্পণ করিত না; লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইত; কেহ কেহ বা দৈবাৎ পদস্থাপন করিলে হঠাৎ হটিয়া আসিয়া ক্ষমা চাহিত ও বহুত বহুত সেলাম জানাইত। সন্ধ্যার পরে অনেকেই তথায় আলোক ব্যতীত আসিত না। এত দিন পরে ঔরঙ্গজেব দারার রুধির-প্লাবিত ছিন্ন মুণ্ড, সুজার রুধিরসিক্ত বক্ষ, মহম্মদের পিতামহ দ্রোহদগ্ধ অনুতপ্ত মলিন বদন এবং মুরাদের বিষজর্জ্জরিত পরিম্লান বদন-কমল কল্পনার নেত্রে দেখিতে দেখিতে নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে বিরাজিত

হইলেন। এইরূপে অনুসন্ধানকার্য্য আপাততঃ স্থগিত থাকিল। ওদিকে সেনাপতি মীর জুমলা সুজার অনুসন্ধানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আসাম-বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু আসামের অস্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর দোষে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া সত্বরেই তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী-পূর্ণ-জীবনের যবনিকাপাত করিলেন।

ত্রয়োদশ লহরী।

শাসন-বিপর্য্যয়ে।

ঔরঙ্গজেব ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের একাধিপত্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আকবর শাহ প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতির সম্যক্ বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব মস্ত মাংস স্পর্শ করিতেন না; মুসলমান ফকীরগণের কঠোর নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতেন। পাঁচবার স্থলে সাতবার নমাজ করিতেন। সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতেন। চিত্ত-সংযম, বিলাসহীনতা, সৎসাহস, আত্মনির্ভর, অনলস, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, নিরন্তর কার্য্যতৎপরতা, রাজ্যের সকল বিভাগের সকল কার্য্যেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বীরত্ব, অটল প্রতিজ্ঞা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি রাজোচিত নানা সদ্‌গুণে তিনি বিভূষিত থাকিলেও, কেবলমাত্র গোঁড়ামি ও বিশ্বাসহীনতা এবং সন্দিগ্ধচিত্ততার দোষে এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনে বড়ই অপটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, মহম্মদীয় ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম; সুতরাং সেই ধর্ম্মে অবিশ্বাসীমাত্রেই ধর্ম্মের বিরোধী; সুতরাং সম্পূর্ণ দণ্ডার্হ। এই বুদ্ধিতে তিনি হিন্দুদিগের মন্দিরসকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন; দেবমূর্ত্তি সকল বিচূর্ণিত করিতে আদেশ দিলেন। হিন্দুদিগের তীর্থ যাত্রার উপর কর বসাইলেন; প্রত্যেক হিন্দু বা অবিশ্বাসীর উপর জিজ্রিয়া নামক মাথট বসাইলেন; হিন্দুগণের সহিত পূর্ব্ববৎ আত্মীয়তা বন্ধ করিলেন; তাহাদিগকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; পদে পদে হিন্দুর অব-মাননা ও মুসলমানের প্রশ্রয় প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সাজাহান ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে রঙ্গমহলে বন্দী হয়েন এবং তদবস্থায় ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়তম মমতাজমহলের পার্শ্বেই সমাহিত হয়েন।

এই ৮ বৎসর কাল মধ্যে সাজাহানেরও সমুদায় শাসনপদ্ধতির বিপর্য্যয় সাধন হয়। সাজাহান মুক্তহস্ত ও সম্রাটোপযোগী উদারহৃদয় ছিলেন। তিনি নূতন দিল্লি বা সাজাহানাবাদের ও আগ্রার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে সুশৃঙ্খলা ও শান্তিস্থাপন জন্য প্রয়োজনীয়

কর্ম্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, শান্তিরক্ষক সৈন্যাদির সংস্থান এবং তাহাদের অবাধ গতিবিধির জন্য রাজ্যময় পন্থাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টুপিতে জরীর কার্য্য করিতেন; তাহা অবশ্য বহুমূল্যে ওমরাহগণ ক্রয় করিতেন। রাজকোষ হইতে নিজ ব্যয় গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু রাজপরিবারস্থ সকলেই উদ্দাম বিলাস-তরঙ্গে সর্ব্বদাই ভাসমান ছিলেন। সে ব্যয় অবশ্যই রাজকোষ হইতে গৃহীত হইত। ঔরঙ্গজেব সম্রাট হইয়াই প্রথমে আকবর প্রচলিত "ইলাহি" সৌর বৎসর উঠাইয়া আরবী চান্দ্র মাস ও বৎসর প্রবর্ত্তিত করিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে জিজিয়ার পুনঃ প্রবর্ত্তনে হিন্দু প্রজাবর্গ বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহারা সম্রাটের বিপক্ষে ধর্ম্মঘট করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট যেখানে যাইতেন, সেখানকার হিন্দুগণ দোকানপাঠ সব বন্ধ করিয়া দিত। দিল্লিতে এইরূপ ঘটায় সম্রাট বন-হস্তী সকল আনাইয়া হিন্দু প্রজাগণকে হস্তী-পদদলিত করিতে লাগিলেন। সম্রাট আগ্রার মন্দির সকল ভূমিসাৎ করিয়া, মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি সকল আনাইয়া, মসজিদের সোপানে গাঁথিয়া দিবার আদেশ দিলেন। তাহাতে ঐ সকল মূর্ত্তি মাড়াইয়া মুসলমানগণ মসজিদে নমাজ করিতে যাইবেন— এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। উদয়পুর, যোধপুর, বারাণসী, ও মথুরায়ও এই ব্যবস্থা হইল। এই কয়স্থলেই হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তদুপরি মসজিদ নির্ম্মিত হইল। হিন্দু সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ পাল্কী প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া যাইলে মুসলমান ওমরাহদিগের দ্বারা অবমানিত হইতে লাগিল। হিন্দুবণিকদিগের উপর অতিরিক্ত মাশুল ধার্য্য হইতে লাগিল; হিন্দু তীর্থাদির উপর মাশুল বসিল। হিন্দু-মুসলমানের প্রতি ব্যবহারে এইরূপ ভেদ প্রদর্শনের অনিবার্য্য ফল যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতে লাগিল। আদর্শ মুসলমান নরপতিরূপে তিনি মুসলমান প্রজাগণের সবিশেষ পূজার্হ হইলেন; আর হিন্দু প্রজাবর্গের নিকট তিনি নিরতিশয় বিরাগভাজন হইতে লাগিলেন। তখনও ভারতীয় হিন্দু শক্তি অন্তর্হিত হয় নাই; সুতরাং হিন্দুর অতি প্রিয় ধর্ম্মবলের উপর এই হস্তক্ষেপে সর্ব্বত্রই বিদ্রোহানলের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নার্ণাওলের সৎনামী সম্প্রদায়, রাজপুতনার রাজপুতগণ এবং মহারাষ্ট্রের মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সকল ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রস্তুত হইল।

যখন যোধপুরের মন্দিরসকল সম্রাটের আদেশে ভূমিসাৎ হইল এবং দেবমূর্ত্তি দিল্লিতে আনীত হইল, যখন উদয়পুরের মন্দিররক্ষকগণ মন্দির ও দেবমূর্ত্তি

রক্ষার জন্য সংগ্রামে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলেন, যখন এইরূপে তিনশত প্রধান হিন্দু মন্দির চূর্ণীকৃত হইল, তখন মহাপ্রাণ রাজপুতকেশরী উদয়পুররাজ রাণা রাজসিংহ সম্রাটকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

"আপনার মহাপ্রাণ প্রপিতামহ সম্রাট মহম্মদ জালালউদ্দীন আকবর শাহ সসম্মানে ও নিরাপদে বায়ান্ন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাবৃন্দকে পালন করিয়াছিলেন। যীশু ভক্ত হউক, আর মুশা ভক্তই হউক, মহম্মদ ভক্তই হউক কিম্বা ব্রাহ্মণ ভক্ত হউক অথবা নাস্তিক হউক, সকলেই সমান রূপে তাঁহার অনুগ্রহভাজন ছিলেন। পরে আপনার পিতামহ প্রবল প্রতাপ জাঁহাগীর বাদশাহও বাইশ বৎসর কাল তাঁহার প্রজাবর্গের উপর তাঁহার অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে আপনার পিতৃদেব বিখ্যাতকীর্ত্তি সম্রাট্‌প্রবর শাহজাঁহা বত্রিশ বৎসর কালব্যাপী অপরিসীম দয়া ও ন্যায়পরতার ফলস্বরূপ প্রজাপালনে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই একশত ছয় বৎসর মধ্যে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন দ্বারা বিপুল মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, ধর্ম্ম-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দ্বারা সে শান্তির ব্যতিক্রম সম্ভাবনা, আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী, সুপণ্ডিত, রণকুশল, অমিত সাহস এবং প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির শাসনকালে কখনই আশা করা যায় না। উদয়পুরের রাজকর্ম্মচারিগণ যাহা করিয়াছে, তাহা যে কখনই আপনার অভিপ্রেত ছিল না, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ থাকিলে দিল্লিশ্বরকে এই অনুরোধ-পত্র লিখিয়া আমি কখনও বিরক্ত করিতাম না। কাফের সম্প্রদায় যদি দিল্লির জুমামস্‌জিদের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিত এবং তজ্জন্য ইস্‌লামী মন্দির রক্ষকগণ ধর্ম্মরক্ষার্থ এইরূপে মন্দির দ্বারা তরবারি হস্তে বীরত্ব দেখাইতে দেখাইতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া আপনার প্রাণে যে ভাবোদয় হইত সেই ভাব লইয়াই অদ্য আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; সুতরাং ইহাতে সরল প্রাণের মর্ম্মবেদনা মাত্র আপনার রাজশ্রী সন্নিধানে নিবেদিত হইয়াছে নিশ্চয় জানিবেন। যদি মোগলসম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণ শান্তিভঙ্গ আমার তিল মাত্র অভিপ্রেত হইত, কখনই এই সামান্য ব্যক্তি এই বিষয় লইয়া আপনার বহুমূল্য সময়ের অপব্যয়ে সাহসী হইত না। কিন্তু এই সকল কর্ম্মচারিবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতা যে সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতিকারক তাহা আপনাকে কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে?" যে সম্রাট্‌ ভারতে একচ্ছত্রী মুসলমানসাম্রাজ্য স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যাঁহার স্থির ধারণা মুসলমান না হইলে অনন্ত নরকের পথ উন্মুক্ত; প্রজা মুসলমান না হইলে তাহার

পারলৌকিক পরিণাম বড়ই শোচনীয়,- সেই দৃঢ় ব্রত মুসলমান সম্রাটের নিকট এইরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ অমূল্য উপদেশ যে অরণ্যে রোদন হইবে মহারাণা বুঝিলে আর এ বৃথা প্রয়াস করিতেন না। এই শাসন বিপর্য্যয়ের পরিণাম সুতরাং অনিবার্য্য হইল।

চতুর্দ্দশ লহরী

শিবাজী সংঘর্ষে।

উদয়পুর হইতে একটী রাজপুত বংশ আসিয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। জাঁহাগীর বাদশাহের রাজত্বকালে আহম্মদ নগরের নিজাম সরকারে একটী মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার কর্ম্ম করিতেন। তিনি উদয়পুর হইতে সমাগত সাহাজী ভোঁসলার সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে সাহাজীর একটী পুত্র হয়। তাহার নাম তিনি শিবাজী রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে শিবাজী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। সাহাজী বিজাপুররাজ্যের অধীনস্থ একজন জায়গীরদার ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের জন্মের ৮ বৎসর পরে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিবাজীর জন্ম হয়। যখন ঔরঙ্গজেব সিংহাসন লাভের জন্য আত্মীয় রুধির-স্রোতে ভাসমান, তখন শিবাজী পার্ব্বত্য মাওয়ালী জাতিকে ধীরে ধীরে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া দুর্দ্ধর্ষ-বীরজাতিতে পরিণত করিতেছিলেন। এই মাওয়ালি জাতির সহায়তায় শিবাজী বিজাপুর-রাজের অধীনস্থ টৌর্ণা দুর্গ হঠাৎ দখল করিয়া লইলেন। টৌর্ণার পর রায়গড় ও সিংহগড় দুর্গ শিবাজীর আয়ত্তাধীন হইল। এই সংবাদ বিজাপুরপতি প্রাপ্ত হইয়া শিবাজীর পিতা সাহাজীকে কারারুদ্ধ করিলেন। শিবাজী মহা বিপদে পড়িলেন। একদিকে পিতা অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের ভাবী উন্নতি! এক সময়ে শাহজাঁহা-দুহিতা রোশেনারা কঙ্কনের পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দিল্লি যাইতেছিলেন। রোশেনারা চিরদিনই ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী; ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে নিযুক্ত। দিল্লি হইতে রোশেনারা ভ্রাতার অনুগমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য রোশেনারার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না হওয়ায়, উপযুক্ত রক্ষিবর্গ সমভিব্যাহারে লুণ্ঠিত রত্নাদি সহ রোশেনারাকে ঔরঙ্গজেব দিল্লি প্রেরণ করেন। তখন সাজাহান দিল্লির সিংহাসনে। ঔরঙ্গজেব তাঁহারই আদেশে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই রত্ন ও খাজানার সংবাদ পূর্ব্ব হইতে পাইয়া শিবাজী স্বীয় মাওয়ালী সৈন্য সহ একটী গিরিশঙ্কটে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রক্ষিবর্গ উক্ত গিরিশঙ্কটে একে একে প্রবেশ করিলে পর উহারা শিবাজীর সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাভূত ও তাহাদের ধন রত্নাদি লুণ্ঠিত হইল। মাওয়ালীগণ শিবিকা সহ বন্দীগণকে শিবাজীর

টোর্ণা দুর্গে লইয়া গেল। রোশেনারা সেই দুর্গেই শিবাজী সমীপে নীতা হইয়া তৎ-কর্তৃক সসম্ভ্রমে, পুনরায় রক্ষিবর্গ ও রত্নাদিসহ পিতৃ সন্নিধানে প্রেরিতা হয়েন। সেই টোর্ণাদুর্গে অবস্থানকালে রোশেনারা শিবাজীর মনুষত্ব, উদারতা এবং বীরত্ব দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া অঙ্গুরীয় বিনিময় করেন। শিবাজী স্বধর্ম্ম ত্যাগে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় অগত্যা শাহজাদী ক্ষুণ্ণ মনে দিল্লিতে ফিরিয়া যান। এই অনুরাগিণী রোশেনারার সাহায্যে শিবাজী সাহাজীর উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন।

রোশেনারা শিবাজীর পত্র পাইয়া, শিবাজীকে লিখেন—শিবাজী যেন সাজাহানের নিকট অধীনতা বিজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। সাজাহান তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিজাপুরপতিকে সাহাজীর মুক্তি প্রদান করিতে বলেন। তাহাতেই সাহাজী কারামুক্ত হয়েন। ইহার পর ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে শিবাজী বিজাপুরপতির সহিত মিলিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব সেই "পার্ব্বত্য মূষিককে" শাসন করিবার জন্য সেনাপতির পর সেনাপতি প্রেরণ করেন। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁর পতনের পর মোগল সেনাপতিমাত্রেই শিবাজীর সহিত অতি সতর্ক ব্যবহার করিতেন। মোগল সেনাপতিগণও এইজন্য বড়ই সাবধানে শিবাজী দমনে নিযুক্ত হইলেন। আফজল খাঁ শিবাজীর শাসনে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শিবাজী বস্ত্রাভ্যন্তরে জালিকবর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক কেবল মাত্র 'বাঘনখ' নামক অস্ত্র হস্ত মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া আফজল খাঁর সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন। আফজল খাঁ কিন্তু, শিবাজীকে গুপ্তভাবে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা রাখিয়া শিবাজীকে একাকী নিরস্ত্র আসিতে বলেন। উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলে শিবাজী যখন দেখিলেন—আফজল তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত, তখন তিনি আত্মরক্ষার্থ অগত্যা 'বাঘনখ' ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে আফজলের পঞ্চত্বলাভ ঘটে। শিবাজীর সৈন্যও বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহারাও আফজলের সৈন্যকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

এই ব্যাপারের পর মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ যখন পুনানগর অধিকার করিয়া শিবাজীর বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন; তখন তিনি আফজলের পরিণাম স্মরণ করিয়া অতি সাবধানে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু শিবাজী সসৈন্যে বরযাত্রিবেশে একটী বিবাহের মিছিলে যোগদান করিয়া শায়েস্তা খাঁর

আবাসস্থল হঠাৎ আক্রমণ করেন। পলায়নকালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে অঙ্গুলিহীন হইয়া শায়েস্তা খাঁ বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। ইহার পর সেনাপতি দিলির খাঁ আসিয়া শিবাজীর দমনে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি দুর্গের পর দুর্গ দখল করিলেও শিবাজীর পরাজয় সাধন করিতে পারেন নাই। অবশেষে মহারাজ যশোবন্ত ও মহারাজ জয়সিংহ এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রবল মোগল-বাহিনী নিয়োগে শিবাজীর দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত ও জয়সিংহের সৈন্যবলের নিকট শিবাজীর অল্পসংখ্যক মাওয়ালী সৈন্য নগণ্য মাত্র বুঝিয়া নিরর্থক লোকক্ষয়ে শিবাজীর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ছদ্মবেশে মহারাজ জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"হিন্দুর সহায় হিন্দু। সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলমান উভয়কে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুসলমান প্রজার পক্ষপাতী এবং হিন্দু প্রজার মহা বিরোধী। হিন্দুর তীর্থ, হিন্দুর মন্দির, হিন্দুর দেবতা, হিন্দুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম মোগলের পদদলিত। হিন্দুর হিন্দুয়ানী রক্ষা করিবার জন্য তিনি সামান্য ব্যক্তি হইলেও একমাত্র ভবানীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া প্রবল মোগলের বিপক্ষে প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্রবল এই প্রবল শক্তির নিকট নগণ্য ও তুচ্ছ। মহারাজ জয়সিংহ সেই প্রবল শক্তির অধিনায়ক। ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক হিন্দু অমিতবল জয়সিংহের দিকে কাতরদৃষ্টিতে স্বধর্ম্ম রক্ষার আশায় তাকাইয়া আছেন। হিন্দুর হিন্দুয়ানী রক্ষার ভার অদ্য সেই জয়সিংহের হস্তে দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। শিবাজী দমনে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; মহারাজ যদি এই পবিত্র ভার গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন।"

শিবাজীর এই অপূর্ব্ব সৎসাহস আত্মত্যাগ এবং স্বদেশ-হিতৈষিতা দর্শনে মহারাজ জয়সিংহ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে নিজেকে বহু ধিক্কার দিয়া বলিলেন, যাহাতে আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার না হয়, তাহা তিনি করিবেন; এবং শিবাজীর ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতির দ্বারা মোগলের শক্তি আরও উপচিত হইবে এই আশায় তিনি সম্রাটের সহিত শিবাজীর মিলন করাইয়া দিলেন। জয়সিংহের চেষ্টায় শিবাজী স্বীয় দুর্গাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঁচ হাজারী খেতাব প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী দিল্লির দরবারে আহূত হইলেন। স্বীয় পুত্র শম্ভুজীর

সহিত শিবাজী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ দিল্লিতে উপস্থিত হইলেন। তথাকার দরবারে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে সামান্য সেনাপতির আসন দান করায় ও অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করায় শিবাজী বিনানুমতিতে দরবার ত্যাগ করেন। ইহাতে সম্রাট তাঁহাকে স্বীয় আবাস-গৃহে বন্দী করেন। চতুর শিবাজী পৌর্ণমাসী নামক সাধুভোজন ব্রতের উপলক্ষ্য করিয়া দিল্লিস্থ সাধুবর্গকে ঝাঁকায় ঝাঁকায় মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। সেইরূপ দুইটি আবৃত ঝাঁকায় আরোহণ করিয়া শিবাজী গোপনে দিল্লিত্যাগ করেন। তাঁহার সিদ্ধগুরু রামদাস স্বামী রোশেনারা প্রেরিত অশ্বত্রয় লইয়া দিল্লির বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন। শিবাজী শম্ভুকে লইয়া বাহিরে আসিবামাত্র রামদাস স্বামী উভয়কে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগত হইলেন। মহারাষ্ট্রে আসিয়াই শিবাজী পুনরায় মোগলের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে সমুদায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন করিয়া লইলেন। তখন শিবাজী স্বামী রামদাস কর্তৃক স্বাধীন নরপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহারাজ জয়সিংহের মৃত্যু এবং রাজপুতগণের সহিত ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষ ঘটায় ঔরঙ্গজেব শিবাজী দমনে সফলকাম হইলেন না। উত্তরে সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে পশ্চিম ঘাটগিরি এবং পূর্ব্বে কর্ণাটের সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ শিবাজীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

পঞ্চদশ লহরী

সৎনাম-দমনে।

নার্ণুলের সন্নিকটে সৎনামী নামক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় কৃষি কার্য্যদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহাদের বেশভূষা আচার ব্যবহার সমুদায় স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা কদাচ মিথ্যাকথা বা প্রবঞ্চনা জানিত না। তাহাদের প্রকৃতি ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিল। সম্রাট তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় এই সৎনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইল। অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারিবৃন্দকে পরাভূত করিয়া সৎনামীর দল নার্ণুল অধিকার করিল। তাহারা ক্রমে চতুর্দ্দিকের হিন্দুগণের সহায়তায় মোগলবাহিনীকে পরাজিত করিয়া দিল্লির ত্রিশ মাইলের কোল পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিল। তাহারা তথন নবাধিকৃত ভূভাগে হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া হিন্দু রাজ-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিল। তাহাদের দেখাদেখি নিকট-বর্ত্তী রাজন্যবর্গও স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার যথাকালে সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, ঔরঙ্গজেব আর কোনও সেনা-পতির উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর সহিত ক্ষুদ্র সৎনামী-সম্প্রদায় বহুকাল প্রাণপণে ও অসীম বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে একে একে সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়া ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত শান্তি অর্জ্জন করিল। এই অদ্ভুতকর্ম্মা বীর-সম্প্রদায়ের এক জনও পরাজয় স্বীকার করিয়া জীবন ধারণ করিতে স্বীকৃত হইল না। ঔরঙ্গজেব এই সম্প্রদায়ের অমানুষিক ধৈর্য্য, শৌর্য্য ও স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত হইয়া অবশিষ্ট সৎনামীগণকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মদ্রোহীর নিকট জীবনদানগ্রহণা-পেক্ষা সম্মুখসমরে দেহত্যাগ শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিল। এই রূপে এই মহা-প্রাণ সৎনামী সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন করিয়া সম্রাট রাজপুতানার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। দাক্ষিণাত্যেই মহারাজ জয়সিংহের মৃত্যু ঘটে। মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে সম্রাট কাবুল শাসনে প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর রাজার পুত্রদ্বয়কে লইয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে আসিয়া অনুচরগণ শুনিলেন, সম্রাট যশোবন্তের পুত্রদ্বয়কে

আশ্রয়ে আনিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ও ওমরাহ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আগ্রাতেই রাখিতে চাহেন। এই দুরভিসন্ধির কথা বিদিত হইয়া যশোবন্তের অনুচরগণ পুত্রদ্বয় লইয়া রাজপুতানা অভিমুখে প্রস্থান করেন। রাজপুতগণ তাঁহার সাহায্য জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। বিশেষতঃ মহারাজ রাজসিংহ এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়া ঔরঙ্গজেব প্রেরিত একদল সৈন্যের পথরোধ করিবার জন্য রাজপুত সৈন্য নিয়োগ করেন। একেত রাজসিংহ সম্রাটকে উপদেশ দিয়া পত্র লেখায়, ঔরঙ্গজেব সেই ধৃষ্ঠতার শাসনে কৃতসংকল্প ছিলেন; তদুপরি রাজসিংহের এই সৈন্য প্রেরণ বার্ত্তা এবং রূপনগরের রাজকুমারীকে মোগল সৈন্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ঔরঙ্গজেবকে পত্নীলাভে তিনি বঞ্চিত করিয়াছেন অবগত হইয়া, অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া রাজ সিংহ ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের দমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এদিকে মহারাজ যশোবন্তের অনুচরবর্গ এই পুত্রদ্বয়কে লইয়া বড়ই বিপন্ন হইলেন। রাজসিংহের প্রেরিত সৈন্য আসিতে না আসিতে ঔরঙ্গজেব প্রেরিত অন্য একদল সৈন্য আসিয়া রক্ষিগণের গতিরোধ করিল। তখন তাঁহারা মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্রদ্বয়কে সন্ন্যাসী বেশে সজ্জিত করিয়া জয়সিংহের আশ্রয়াভিমুখে গোপনে প্রেরণ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে জীবন পণ করিলেন।

তাঁহারা ঔরঙ্গজেবের সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ও দুইটী পটাবৃত শূন্য শিবিকার চতুর্দ্দিকে ত্রিকোণ ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে সেই বিপুল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আক্রমণকারিগণের সাধ্য কি সেই ব্যূহ ভেদ করে! একে একে রাজপুতবীরগণ যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই সেইখানেই দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মুসলমানগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন দিবাবসানে শেষ রক্ষীবীর প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, তখন "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিয়া মোগলগণ আবৃত শিবিকাদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিল। কিছু দূরেই বাহকগণের কথায় তাহারা শিবিকা খুলিয়া শূন্য দেখিয়া পুনরায় যশোবন্তপুত্রদ্বয়ের অনুসন্ধানে ধাবিত হইল। কিন্তু পথিমধ্যেই রাজসিংহ-প্রেরিত সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া বিষণ্ণ বদনে আগ্রায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। এ দিকে বিজয়ী রাজপুতগণ সম্মুখসমরে হত সেই ক্ষত্রিয়গণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সত্বরে যশোবন্ত মহিষী ও পুত্রদ্বয়ের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহাদিগকে তখন তাঁহারা রাজসিংহের সমীপে আনয়ন করিলেন। মহারাজ-রাজসিংহ তাঁহাদিগকে কিছুদিন নিজবাসে রাখিয়া নিরাপদে যোধপুর প্রেরণ করিলেন। তখন উদয়পুর

ও যোধপুরে "সাজ" "সাজ" রব উত্থিত হইল। কারণ "সৎনামী" ও যশোবন্ত-দ্রোহী ঔরঙ্গজেব বিপুল সৈন্য লইয়া রাজপুতানা দমনে যাত্রা করিয়াছেন, এই সংবাদ রাজসিংহ চরমুখে শ্রুত হইয়াছিলেন। মোগলসম্রাটের ক্রোধের আরও একটী কারণ ছিল; সম্রাট পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী রূপনগর নামক ক্ষুদ্ররাজ্যের অধিপতিরাজা বিক্রমসিংহের কন্যাকে বেগম শ্রেণীতে স্থান দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, রাজকন্যা এজন্য রাজসিংহের সহায়তাপ্রার্থিনী হওয়ায়, রাণা রাজকন্যাকে মোগল সৈন্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন এবং স্বীয় অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। এই অপমানের শোধ লওয়াও ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের অন্যতর কারণ।

ষোড়শ লহরী।

গুরু-শিষ্যে।

মহারাজ জয়সিংহের ও যশোবন্তসিংহের দেহান্তে শিবাজী নির্ব্বিবাদে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যু ঘটে এবং শিবাজীও অভিষিক্ত হয়েন। সেই বৎসরই যুবরাজ মোয়াজ্জম দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। সম্রাট্ প্রথম পুত্র মহম্মদকে সুজার সহিত মিলিত হওয়া অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারেই ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। মহম্মদের জননী হিন্দুবংশীয়া ছিলেন। তাঁহারই দ্বিতীয় পুত্র মোয়াজ্জম সুতরাং এখন যুবরাজ হইয়া ছিলেন। রূপসিংহের দুহিতার সহিত সম্রাট ইহাঁরই বিবাহ দেন, কিন্তু ইহাঁকে রাজপুত সমরে নিয়োগ করিলে পাছে ইনি হিন্দু মাতামহ ও হিন্দু শ্বশুরকুলের আকর্ষণে রাজপুতগণের পক্ষাবলম্বন করেন, এই আশঙ্কায় সম্রাট তাহাকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী দমনে প্রেরণ করেন। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আজাম ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইহাঁর জননী পারস্যদেশীয়া ছিলেন। তাঁহারই দ্বিতীয় পুত্র কুমার আকবরকেই সম্রাট রাজপুত দমনে নিজসঙ্গে লইয়া যান; কারণ আকবর খাঁটি মুসলমান শোণিতজাত। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োবিংশ-বর্ষে আকবর পদার্পণ করিয়াছিলেন। আকবর বীর হৃদয়, উদারপ্রাণ ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। আকবরকে রাজপুত দমনে নিয়োগ করিয়া সম্রাট বড়ই ভুল করিয়াছিলেন। রাজপুত শৌর্য্য ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া বীরবর আকবর রাজপুতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন; কিন্তু যুবরাজ মোয়াজ্জম শিবাজীর বিপক্ষে বড়ই উদ্যম সহকারে যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেও, সেই মহারাষ্ট্র কেশরীর কোনও ক্ষতি করিতে সমর্থ হইলেন না। বরং শিবাজী গোয়াপর্য্যন্ত নিজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়া লইলেন এবং ইংরাজ কুঠী সুরাট লুণ্ঠন করিয়া চৌথ আদায় করিলেন। এমন কি মক্কাযাত্রী দুইটী শস্যপূর্ণ জাহাজও লুঠ করিয়া লইলেন। তাঁহার নৌ-বহর সমুদ্রপথে আরবগণের বিভীষিকা উৎপাদন করিতে লাগিল। এদিকে শিবাজীসৈন্য তাঞ্জোর দখল করিয়া লইল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর-বিজয় হয়। শিবাজীর রাজ্য বিস্তৃতির এই পরাকাষ্ঠার পর তিনি অধিকৃত ভূভাগে সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

একদিন মৃগয়া ব্যপদেশে শিবাজী একটি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পশুপক্ষী কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই বনে শিকারের কদাচ অভাব থাকে না, অথচ সে দিন এইরূপ ভাব দেখিয়া শিবাজী ক্রমেই গভীর বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই গভীর প্রদেশে একটী শষ্পমণ্ডিত বৃক্ষশূন্য ভূভাগ রহিয়াছে। সেই মাঠেই যত পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আনন্দসহকারে একটী মৃগের দিকে লক্ষ্য সন্ধান করিতে গিয়া শিবাজী যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! দেখিলেন সেই পশুব্যূহের কেন্দ্রভাগে একটি সাধু ধ্যানস্তিমিত নয়নে উপবিষ্ট। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু প্রবাহ গণ্ড বহিয়া পতিত হইতেছে; একটি পক্ষী তাঁহার বাহু অবলম্বন করিয়া সেই অশ্রুধারা পান করিতেছে! তখন আরও বিস্ময়ের সহিত শিবাজী দেখিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া কোনও পশু বা পক্ষী কিছুমাত্র ভীত হইয়া ব্যূহ ত্যাগ করিল না। নিকটে আসিয়া শিবাজী দেখিলেন, সেই সাধু আর কেহ নহেন—তাঁহারই গুরু রামদাস স্বামী! এই স্বামীজীর সহিত বিপদে, অরণ্যে, শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁহার প্রথম দর্শন হয়। সেইবার তাঁহারই ইঙ্গিতে তিনি পার্শ্বদেশস্থ পার্ব্বত্য পথ অবলম্বনে শত্রু হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া স্বামীজীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তদবধি তাঁহারই আদেশ পালন করিয়া সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বামীজীর সমাহিত অবস্থা ও আশ্রিতবাৎসল্য দেখিয়া শিবাজী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী রামদাস নয়ন উন্মীলন করিলে পর শিবাজী বলিলেন,—"ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া কতই পশুবধ, কতই শত্রুবধ করিতে হইয়াছে! আপনি চিন্তাতেও কাহারও হিংসা করেন না; অহিংসা প্রতিষ্ঠায় আপনার নিকট জীবগণ বশীভূত ও আশ্রয় এবং অভয় প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রভো, এই সকল প্রাণিসংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া না জানি কতই অপরাধ করিয়াছি; তজ্জন্য অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমাকে এই শান্তিময় শ্রেয়স্কর পথের যাত্রী করিয়া দিন। আমি আপনার চরণে অদ্য একান্ত শরণ লইলাম। তখন স্বামীজী তাঁহাকে মুক্তি পথের উচ্চসাধনে দীক্ষিত করিলেন। শিবাজী দীক্ষিত ও কৃতার্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদান করিলেন। রামদাস কহিলেন "বৎস, আমি সন্ন্যাসী, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; তথাপি তোমার দান গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে আমিই এই হিন্দু রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হইলাম, কিন্তু তোমাকেই এই

রাজ্য পরিচালনের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম। আমারই আদেশ লইয়া তুমি সাবধানে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাক।" মহারাজ শিবাজী অগত্যা গুরু-নিয়োগে পুনরায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আর যুদ্ধাদি প্রাণীবধকর কোনও কার্য্য নিযুক্ত না হইয়া, অবসর কালে ভবানীর রাতুলচরণদ্বয় চিন্তাতেই অতিবাহিত করিতেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী স্বামী রামদাসের চরণে মস্তক রাখিয়া পরমধামে গমন করিলেন। রহিল কেবল শম্ভোজী। তখন স্বামী রামদাস উত্তরখণ্ডে তীর্থ ব্যপদেশে প্রস্থান করিলেন; মহারাষ্ট্রে আর ফিরিলেন না। মহারাষ্ট্রের শান্তিও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সপ্তদশ লহরী।



দিল্লির দরবারে।

শিবাজীর পরোলোকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "কাফর বা জাহান্নম্ রফত্।" অবিশ্বাসী বা কাফের জাহান্নমে অর্থাৎ নরকে গিয়াছে। তৎপরে বলিলেন "এই পার্ব্বত্য মূষিকটা কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি ছিল। গত ঊনবিংশ বর্ষ ধরিয়া আমি ইহার বিপক্ষে ক্রমাগত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি; মহারাজ যশোবন্ত, দিলীরখাঁ, মহারাজ জয়সিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছি; অর্থ, সৈন্য ও বুদ্ধি ব্যয় যথেষ্ট করিয়াছি,—তথাপি তাহার রাজ্য ক্রমাগত বর্দ্ধিতই হইয়াছে। দুর্ব্বল বৃদ্ধ স্ত্রী ও শিশুর বিপক্ষে সে কখনও অস্ত্রধারণ করে নাই; কি হিন্দু, কি মুসলমান কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে নাই। লোকটীকে হাতে পাইয়া বাগাইতে পারিলাম না; ইহা কেবল প্রহরিগণের নির্বুদ্ধিতা দোষে ঘটে। মুসলমান হইলে লোকটী স্বর্গগমনের উপযুক্ত হইত; কিন্তু কাফেরের কাফের এই মূষিক জাহান্নমেই স্থান লাভ করিয়াছে কিন্তু আমার বিরাম কই? আর এক কাফের আবার স্বাধীন হইবার মতলব করিয়াছে; তবে এটা পার্ব্বত্য মূষিক নয়, মরুভূমিবাসী শৃগাল। দেখি, সিংহের সহিত কতদিন লড়িতে পারে?" সম্রাটের এই "শৃগালটি" মহারাজ রাজসিংহ। এখন সম্রাট এই রাজপ্রবরের দমনে নিযুক্ত হইলেন। রাজপুতানা আক্রমণের পূর্ব্বে সম্রাট দেওয়ানী আমে (বা সাধারণ দরবারে) এক বিরাট সভা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব অধিকাংশ সময় সাজাহানাবাদ বা নূতন দিল্লীতে অতিবাহিত করিতেন। আগ্রায় কেবল শীতের কয়মাস থাকিতেন। এই নূতন দিল্লী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যমুনার দক্ষিণ কূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিল্লী নগরীতে সম্ভ্রান্তগণের প্রাসাদের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর উদ্যান ছিল। অসংখ্য সঙ্কীর্ণ পথের দুইপার্শ্বে নাগরিকগণের আবাস ছিল। সামান্য পদাতিগণের কুটীর বংশ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং নিম্নতন কর্ম্মচারিবৃন্দের আবাস মৃত্তিকা বা ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল; কিন্তু সুভাসদ ও সওদাগরদিগের প্রাসাদ মর্ম্মর নির্ম্মিত ছিল; তৎসহ উদ্যান, উৎস ও নিভৃত বৃক্ষবাটিকাসকল আবাসগুলি বেষ্টন করিয়া

শোভাসম্পাদন করিত। প্রধান দুইটী বর্ত্মের সংযোগ স্থলে প্রকাণ্ড চৌরাস্তা ছিল। সম্রাটের দুর্গের ঠিক সম্মুখভাগে তাহা অবস্থিত ছিল। রাজপুত রাজন্যবর্গ এই স্থানেই শিবির সংস্থাপন করিতেন। তাঁহারা মোগলগণের গৃহে কখনই বাস করিতেন না। দুর্গের ভিতরে সম্রাটের প্রাসাদ ও মহল বা শুদ্ধান্তঃ ছিল। দুর্গপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিখা ছিল, এবং প্রাচীর সকল কামান শ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীরের অষ্ট কোণে আটটী মিনার ছিল। তদুপরি প্রহরিগণ নিরন্তর প্রহরীর কার্য্য করিত এবং চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিত। রাজপ্রাসাদ শ্বেত, কৃষ্ণ এবং লোহিত মর্ম্মরের অপূর্ব্ব সমাবেশে ইন্দ্রপুরীবৎ নয়নাভিরাম ছিল। শুদ্ধান্তঃ বা রংমহলের শোভা অতি অপরূপ ছিল। দুর্গের মধ্যেই নানা দেশীয় শিল্পিগণ নানা প্রকার কারুকার্য্যখচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত। সম্রাট্‌গণ এই সকল শিল্পীর সমাদর করিতেন। চিত্রণ কার্য্য বড়ই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখনও দিল্লীতে হস্তীদন্তফলক ও কাচের উপর চিত্রিত মোগল সম্রাট ও বেগমগণের চিত্রাদি, অঙ্কনলালিত্যে ও বর্ণ গৌরবে পাশ্চাত্য চিত্রকরগণের বিস্ময় উৎপাদন করে।* নানাবিধ প্রস্তরের অপূর্ব্ব সমাবেশ-জালখচিত পর্দ্দাগুলি রংমহলের দ্বারে দ্বারে যে শোভা-সম্পাদন করিয়াছে তাহা দেখিয়া মোগল স্থাপত্যের অতীত গৌরব দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের আবির্ভাব করে। সম্রাটের দেওয়ানি আম না দেখিলে তাহার সৌন্দর্য্য কেবল চিত্রসন্দর্শনে কিছু হৃদয়ঙ্গম হয় না। একবার দেখিলে দরবার হলের উপর যে আরবী-বয়েত লেখা আছে তাহা বাস্তবিকই সত্য বলিয়া বোধ হয়:—

"যদি ভূলোকে কুত্রাপি স্বর্গ থাকে,
তাহা এইখানে, তাহা এইখানে, এইখানে।"x

দরবার-হলে সম্রাট্ স্বীয় সিংহাসনে যথাকালে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র ও মহার্ঘ। তাহা রেশমী ফুলদার শ্বেত শাটিনের। তাহার চারিদিকে জরী ও নানাবর্ণের রেশমী সূতার কারুকার্য্য ছিল। জরীর তাজের উপর একটী প্রকাণ্ড কল্কা তোলা ছিল। কল্কার নিম্নে তিনটী বড় হীরক ও উপরে একটী বড় ফিরোজা বসান ছিল। কল্কার চূড়ায় সুন্দর ময়ূরপুচ্ছের গুচ্ছ ছিল। বড় বড় মুক্তার একছড়া হার সম্রাটের গলদেশ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। সম্রাটের বর্ণ গৌর; ঈষৎ পীতাভ। নাসিকা উন্নত ও দীর্ঘ। নয়ন আয়ত, অর্দ্ধাবৃত, তেজোদীপ্ত ও প্রতিভান্বিত। ললাট প্রশস্ত। শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুসলমান প্রণালীতে কর্ত্তিত। মখমল নির্ম্মিত বহুমূল্য গদিমণ্ডিত

x আমার বাড়ির দৌড়া বকুলে কাটিয়াছ [illegible]

মহার্ঘ্য রত্নখচিত ময়ূর-সিংহাসনে সম্রাট বীরাসনে উপবিষ্ট তাঁহার কটিদেশে একটী বহুমূল্য প্রস্তরখচিত ছোরা ছিল। তাঁহার বেগুনী রেশমী পাজামা পাঞ্জাবী ধরণের। তাঁহার পাদুকা সিংহাসনের পাদপীঠে বিরাজমান ছিল। তাহা মুরদেশীয় জুতার অনুরূপ। জুতায় বহু হীরক কিরণ-বিস্তার করিতেছিল। পার্শ্বে ও পশ্চাতে জরীর কামদার তাকিয়া ছিল। মস্তকোপরি সবুজ রেশমী কারুকার্য্যখচিত রাজছত্র; তাহার ঝালর মুক্তার এবং বাঁট হীরকখচিত স্বর্ণের। সিংহাসনের দুইপার্শ্বে দুইজন চামরধারী ছিল। প্রত্যেক চামরের হাতল হীরকখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত। সম্রাটের বাম পার্শ্বেই বহুমূল্য প্রস্তরখচিত একটী তরবারি কোষবদ্ধ ছিল; তাহার পশ্চাতেই বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত একটী ঢাল শোভা পাইতেছিল। সিংহাসনটীর ময়ূরত্রয়ে ষট্‌পদ। পায়াগুলি খাঁটী সোনার। তাহার উপর চুণি, পান্না ও হীরার বাহার। পাঠান ও হিন্দুরাজগণের কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া পুরুষানুক্রমে মোগল সম্রাটগণ যে সকল রত্ন লাভ করিয়াছিলেন সম্রাট সাজাহান সেই সকল রত্ন দেখাইবার জন্যই এই ময়ূর সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। সম্রাটের সিংহাসনের নিম্নেই একটী রৌপ্য রেলিংঘেরা বেদিকায় বহুমূল্য বিচিত্র পরিচ্ছদধারী ওমরাহগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের বেদিকার উপরে জরীর একটী চন্দ্রাতপ খাটান ছিল; তাহারও বহুমূল্য ঝালর। হলের প্রত্যেক স্তম্ভ বহুমূল্য শাটিন দ্বারা মণ্ডিত ছিল। সেই সকল শাটিনও জরীর কারুকার্য্যশোভিত। সমুদায় দরবার-হলও চন্দ্রাতপে বিভূষিত। হর্ম্ম্যতলও বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রে মণ্ডিত; তাহাতে নানাপ্রকার জরীর ফুল, ফল ও লতা পাতা অঙ্কিত। হলের বাহিরে রৌপ্য স্তম্ভোপরি একটী প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ খাটান ছিল। সেই চন্দ্রাতপে অঙ্কিত ফুল ও ফল দেখিতে এরূপ স্বাভাবিক যেন চন্দ্রাতপটী একটী লম্বমান পুষ্পোদ্যান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। এ হেন সভায় বসিয়া সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব মন্ত্রিবর্গ ও ওমরাহগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন—রাজপুতনাকে তিনদিক হইতে মোয়াজ্জম, আজ্জাম ও আকবর দ্বারা আক্রমণ করা হইবে; এবং সম্রাট্ স্বয়ং মহারাজ রাজসিংহের বিপক্ষে অভিযান করিবেন। ইহাতেই রাজপুতগণকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইরূপে রাজপুতনা জয় করিয়া সম্রাট্ তৎপরে মহারাষ্ট্র শাসনে নিযুক্ত হইবেন। কর্ত্তব্য নির্ণয়ের পর সভাভঙ্গ হইল। তখন দিল্লীতে "সাজ সাজ" রোল পড়িল।

অষ্টাদশ লহরী।



ভ্রাতৃ সমাগমে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শাহাজাদী রোশেনারা মহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্রই রোশেনারা সসম্ভ্রমে সম্রাটকে নিজ নাচঘরে লইয়া গেলেন। তথায় ভিত্তিগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দর্পণ-মণ্ডিত ছিল। ছাদের নিম্নদিকও কাচমণ্ডিত থাকায় কেহ দণ্ডায়মান হইলে চারিদিকের ভিত্তি ও ছাদের নিম্নভাগে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যাইত। সেই গৃহে প্রত্যেক আসন জরীর লতা পুষ্পশোভিত মখমলের গদী মণ্ডিত। সম্রাট উপবিষ্ট হইলে রোশেনারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"জাঁহাপনার এই অযাচিত অনুগ্রহ কোন্ সৌভাগ্য-ফলে?" ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "যাঁহার শুভমন্ত্রণা ও সাহায্য বলে ঔরঙ্গজেব অদ্য আলমগীর বাদশাহ, তাঁহাকে একটী মহা শুভসংবাদ দিবার জন্যই এখানে আসা। ভগিনি শুনিয়া সুখী হইবে, আমাদের সেই মহাদুষ্মন্ পার্ব্বত্য মূষিক শিবাজী কাফেরটা জাহান্নমে গিয়াছে! সে এত দিনে মারা গিয়াছে।" রোশেনারা দণ্ডায়মানা হইয়া কথাটা শুনিতেছিলেন; হঠাৎ নিকটবর্ত্তী আসনে বসিয়া পড়িলেন; ললাটে, গণ্ডে, গ্রীবায় ভয়ানক স্বেদনিঃসরণ হইতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব ব্যস্ত হইয়া নিজ রুমাল লইয়া রোশেনারার ঘর্ম্ম নির্ম্মোচন করিলেন; রোশেনারা হঠাৎ আত্মসংযম করিয়া বলিলেন,—"জাহাপনার কি স্মরণ নাই, এই পার্ব্বত্য মূষিক একদিন এই সিংহিনীর বিপদে কিরূপ মনুষত্ব, উদারতা, সৌজন্য ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাহাকে তাহার পিতার নিকটে নিরাপদে প্রেরণ করিয়াছিল? মোগল নরপতি হইলে সে এই শাহজাদীর বেগমত্ব ঘটাইত! এ হেন নরোত্তম যদি নরকে যায়, তবে তাহার পাদস্পর্শে সেই নরক স্বর্গে পরিণত হইবে।" ঔরঙ্গজেব কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, "কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! ভগিনীর সিরাজীর ঝোঁকটা এখনও কাটে নাই বোধ হয়! কাহাকে কি বলিতেছ? যা'ক সেটাত গিয়াছে, এখন বাকী আছে রাজসিংহ আর তাহার আত্মীয়গণ। ইহাদিগকে শাসন করিয়া মহারাষ্ট্রের দিকে যাইতে হইবে। বহিন্ কি আমার বেগম মহলে কিছুদিন পদার্পণ করিয়া রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রে বেড়াইয়া আসিবে না? তোমার ন্যায় মন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত এ কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। কি অভিমত তোমার?"

এমন সময় হঠাৎ একজন বাঁদী আসিয়া সংবাদ দিল, জেবউন্নিসা ও উদিপুরী বেগমদ্বয় রোশেনারার দর্শনপ্রার্থিনী, অগত্যা রোশেনারা ব্যস্ত হইয়া উভয়কে নাচঘরে আনয়ন করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা ঔরঙ্গজেবকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। ঔরঙ্গজেব-দুহিতা জেবউন্নিসা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি কোথা পিসীমার দরদে দরদ জানাইতে আসিলাম, না, এখানে জাঁহাপনা হাজির।" ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা মহিষী উদিপুরী পরিহাস করিয়া বলিলেন "জাঁহাপনা কি শাহজাদী রোশেনারা বিবি সাহেবের দরদের কথা জানেন, যে তুই দরদ দরদ করিতেছিস্?" এমন সময় রোশেনারা "আমার মাথাটা ঘুরিতেছে, একটা বাঁদীকে গুলাব আনিতে বলি।" বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। তখন উদিপুরী ঔরঙ্গজেবকে শিবাজীর প্রতি রোশেনারার অনুরাগের কথা বলিয়া মাথাঘোরার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। অমনি সময় বুঝিয়া জেবউন্নিসা বলিলেন, "জাঁহাপনা এখন বুঝিতেছেন, আপনি শত চেষ্টা করিয়াও কেন শিবাজীর কিছুই ক্ষতি করিতে পারেন নাই; আর কোন্ বলেই বা সে ব্যক্তি জাঁহাপনার হাতের মুঠার ভিতর হইতে পলাইয়া যায়? জাঁহাপনা যদি মহারাষ্ট্র জয় করিতে যান, শাহজাদীকে সঙ্গে লইয়া গেলে সুবিধা হইবে না। যে হিন্দুকে ভালবাসে, তাহাকে লইয়া হিন্দুর অনিষ্ট করা কতদূর সঙ্গত, আপনি কি আর বুঝিতেছেন না?" ঔরঙ্গজেব কোনও উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ নাচগৃহের গালিচার ফুলগুলি মনোযোগ সহযোগে দেখিতে লাগিলেন। পরে "ওঃ" এইমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন। এমন সময় রোশেনারা মস্তকে গুলাব লাগাইয়া ফিরিলেন। একজন বাঁদী ইতি মধ্যে নাচঘরের সকল কথা গোপনে শুনিয়া রোশেনারাকে জানাইয়াছিল। রোশেনারা হাস্যমুখে আসিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার দরদে দরদী হইয়া জেবউন্নিসা আসিয়াছেন; আমার একটা দরদে যখন তাঁহার এত দরদ; আমারও উচিত তাহার সকল দরদে সমান্ দরদ জানান। আমি জেবউন্নিসার এই ভালবাসায় বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। বেগম সাহেবা উদিপুরীও এজন্য আমার শত শত নমস্কার গ্রহণ করুন। আমি এইমাত্র বলিতে যাইতে ছিলাম; আমার তবিয়ৎ ভাল নাই। এই প্রকাণ্ড সমরকালে পথ ক্লেশ সহন আমার পক্ষে অসম্ভব। বেগম সাহেবাই অনায়াসে জাঁহাপনার প্রধান মন্ত্রীরূপে সর্ব্বদা সঙ্গেই যখন থাকিবেন, তখন এই বাঁদীর অনুপস্থিতি ততটা অনুভূতি হইবে না। তবে জেবউন্নিসা ও উদীপুরী সাহেবার নিশ্চয়ই স্মরণ

আছে, বাঁদী রোশেনারা না থাকিলে, জাহানারা থাকিতে শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের আলমগীর হইবার সম্ভাবনা কম ছিল।" ঔরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রোশেনারাকে একটী আসনে বসাইয়া বলিলেন "ইঁহারা জানে না, কাহাকে কি বলিতেছ, বহিন্, তুমি কিছু মনে করিও না। আমি অন্যসময়ে আসিব। অনেক কথা রহিল।" রোশেনারা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আর এদিকে যে বেগম সাহেবা রহিলেন।" তখন বেগম উদীপুরী ও জেবউন্নিসা এক একটী লম্বা সেলাম করিয়া "কই রহিলেন?" বলিয়া ক্রোধভরে বিদায় লইলেন। রোশেনারা তখন একটী সোফার উপর পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাম হস্তের অনামিকাস্থিত অঙ্গুরীয়টি বারম্বার কাতর নয়নে দেখিয়া দেখিয়া কতই না জানি, সঙ্কোচে অধরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে নাচঘর ত্যাগ করিয়া জেবউন্নিসা অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উদীপুরীকে বলিলেন, "এ অপমানের শাস্তি আমিই দিব জানিবেন। আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না।"

রোশেনারা তদবস্থায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কোনও বাঁদী নিকটে আসিতে সাহসী হইল না। সন্ধ্যার সময় সম্রাট্ আবার আসিলেন; বলিলেন, "রোশেনারা আবার আসিলাম; আমি তোমার জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। আমি এই রাজপুরীতে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকি, আমি তোমাদের কথায় কিছু বলিতে চাহি না, তবে এই কথা বলিতে হইবে সে ব্যক্তি মুসলমান হইলে একজন বড়ই গৌরবের ওমরাহ হইবার যোগ্য ছিল। তুমি এই ভুজগীদ্বয়কে ঘাঁটাইয়া ভাল কর নাই। আমি তোমার গৃহে প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছি।" রোশেনারাকে ঔরঙ্গজেব সত্যই স্নেহ করিতেন, রোশেনারাও তাহা জানিত। ঔরঙ্গজেব জগতের সকলকেই অবিশ্বাস করিতেন, কিন্তু রোশেনারা ব্যতীত। রোশেনারা তখন বলিলেন "ভাই বিষকে ভয় নাই। জীবন এখন লক্ষ্য শূন্য, যদি জেবউন্নিসা বিষ প্রদান করে, আমার উপকারই করিবে।" ঔরঙ্গজেব তখন বলিলেন, "বহিন, এ জগতে ঔরঙ্গেবের হৃদয় খুলিবার একটীমাত্র স্থান আছে; তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে, রোশেনারা তোমার ভ্রাতাকে উন্মাদগ্রস্ত হইতে হইবে। ইহাতে মোগলসাম্রাজ্যের কি লাভ? তোমাকে আমি কিছুতেই হারাইতে পারি না। তোমার হৃদয়ের এই কথা যদি আগে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে শিবাজীকে মুসলমান করিয়া তোমার হস্তে আনিয়া দিয়া, তাহাকেই প্রধান সেনাপতি করিতাম।"

"ভাই, তাঁহাকে তুমি বুঝ নাই। বুঝিতে পারিলে তোমার দক্ষিণ বাহু হেলায় হারাইতে না। তিনি মিত্রভাবে আসিয়া, কেবল তোমার ব্যবস্থার দোষে শত্রু হইয়া ফিরিয়াছিলেন। যাক, আমার জন্য ভাবিও না। আল্লার যদি ইচ্ছা হয়, এই রাজ্যশাসনের গুরুভার হয়ত তোমাকে একাই বহন করিতে হইবে।" তখন ঔরঙ্গজেব অগত্যা বিদায় লইলেন। প্রত্যুষ হইতে না হইতে ঔরঙ্গজেব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন—শাহজাদী রোশেনারা হঠাৎ সর্পাঘাতে প্রত্যুষে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এ সর্প কোথা হইতে কেমনে আসিল, সম্রাটের বুঝিতে বাকী রহিল না। ধুমধামের সহিত শাহজাদীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব কিন্তু একশত খোজার এবং আড়াইশত বাঁদীর গোপনে প্রাণদণ্ড করিলেন এবং একমাস কাল জেবউন্নিসা ও উদিপুরীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। তখন চারিদিকে সমর সজ্জা পড়িয়াছে, এই জন্য সম্রাট অগত্যা অন্যদিকে মন দিয়া বহুকষ্টে রোশেনারার শোক ভুলিলেন।

ঊনবিংশ লহরী।

রাজসিংহ বিরোধ।

মহা আয়োজনের পর ঔরঙ্গজেব রাজপুত-শাসনে বহির্গত হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে পথ পরিষ্কারক সৈন্য কোদালি কুড়ালি লইয়া গাছপালা কাটিয়া পথ বাঁধিয়া চলিল। সেই পথে তখন কামানবাহী শকটশ্রেণী টানিয়া বড় বড় ঘোড়া চলিতে লাগিল; তৎপরে দেখা দিল গোলন্দাজ সেনা। তৎপরে রাজ কোষাগার উষ্ট্র ও হস্তী পৃষ্ঠে বাহিত হইতেছিল। তাহার পর দপ্তরখানা–হিসাব পত্রের খাতা, হাতি গাড়ী প্রভৃতির উপর দেখা গেল। তৎপরেই সুপেয় পানীয় বাহী উষ্ট্রাদি চলিল। তারপর খাদ্য ভাণ্ডার আটা, ঘৃত, চাউল, শাকসবজী, ছাগ মেষ, হংস কুক্কুট প্রভৃতি বহন করিয়া শকটের পর শকট দেখা দিল। তাহাদের পশ্চাতেই পাচক বাবুর্চীগণ। তাহাদের পশ্চাতে তোষাখানা বা পোষাক আদির যান। তাহার পশ্চাতে মোগল অশ্বারোহী সেনা ছিল।

এই বিভাগকে সম্মুখ করিয়া দ্বিতীয় বিভাগ আসিল। ইহা সম্রাটের বিভাগ। ইহার প্রথমেই ধূপ, ধূনা গুগ্‌গুল, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যপূর্ণ অগ্নি-কটাহবাহী উষ্ট্রের সারি। এই সকল জ্বলন্ত কটাহ চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। তৎপরে সম্রাটের শরীররক্ষক অশ্বারোহী সৈন্য। তাহাদের কেন্দ্রস্থলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব মণিরত্নাদি ভূষিত সুসজ্জিত শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে ভুবনবিখ্যাত বহুমূল্য রত্ন শোভিত শ্বেতছত্র। সম্রাটের পশ্চাতে মুক্তার ঝালর শোভিত সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রাবৃত হাওদার ভিতরে রূপের ছটায় চারিদিক আনন্দময় করিয়া, গজপৃষ্ঠবাহিনী সুন্দরীসম্প্রদায় চলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যমণিস্বরূপ হইয়া রত্নখচিত সুবর্ণ নির্ম্মিত হাওদার উপর সওয়ার হইয়া, সম্রাটের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম, (যুবরাজ মহম্মদ ও মোয়াজ্জামের জননী) তাঁহার পার্শ্বেই জর্জিয়াদেশীয়া দারার ভূতপূর্ব্বা ক্রীতদাসী এবং সম্রাটের প্রিয় বেগম উদীপুরী বেগম, তাঁহার পশ্চাতেই সম্রাট দুহিতা দৃপ্তাফণিনীসদৃশা তেজোগর্ব্বদীপ্তা জেবউন্নিসা হস্তীপৃষ্ঠে চলিয়াছেন। বেগমগণের পশ্চাতে তাঁহাদের কুটুম্বিনী নারীরক্ষিবৃন্দ ও দাসীগণ অশ্বপৃষ্ঠে দলে দলে দেখা দিল। তাহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাজ সেনা। তাহাদের পশ্চাতে

বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্য। সর্ব্বশেষে ভৃত্য, কর্ম্মচারী, মুটে মজুর, বাজিকর, নর্ত্তক নর্ত্তকী, প্রভৃতি এবং তাম্বুর রাশি ও মোটঘাট। সম্রাট এই বিপুল বাহিনী লইয়া উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন; মোয়াজ্জাম দক্ষিণ হইতে আসিয়া রাজপুতানা আক্রমণ করিলেন। কাবুল হইতে সাহজাদা আকবর রাজপুতানার উত্তর দিক আক্রমণ করিলেন এবং বঙ্গদেশের শাহজাদা আজাম রাজপুতানার পূর্ব্বদিক আক্রমণ করিলেন। আজমীঢ়ে আসিয়া ঔরঙ্গজেবে ও আকবরে দেখা হইল। তাঁহারা পর্ব্বতমালার মধ্যে তিনটী গিরিসঙ্কট লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার মধ্যে একটীর নাম দোবারি, অন্য দুইটীর নাম দয়েলবারা ও নয়ন। দোবারি পথে আকবরকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া, সম্রাট স্বয়ং মহারাণার মোগলবেশী চরের পরামর্শে নয়ন গিরিসঙ্কটের দিকে প্রস্থান করিলেন। রাজসিংহ সৈনাপত্যে মহাবীর নেপোলিয়ানের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহার ও যোধপুরের সৈন্যবল লইয়া সম্রাটের চারিটী বাহিনীর সহিত বেশীদিন যুদ্ধ করা যে অসম্ভব, তাহা মহারাণা বিলক্ষণ জানিতেন; এই জন্য তিনি সম্রাটের সহিত কেবল গিরিসঙ্কটেই যুদ্ধপ্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। রাজসিংহ তাঁহার সৈন্যের এক ভাগ রাজকুমার জয়সিংহের অধীনে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বিতীয় কুমার ভীমসিংহের অধীনে এবং তৃতীয়ভাগ স্বীয় অধীনে রাখিয়া, নয়ন গিরিসঙ্কটের দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আকবর উদয়পুরের উপত্যকায় প্রবেশ লাভ করিয়া বীরদর্পে উদয়পুরের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাজকুমার জয়সিংহ আকবরের পঞ্চাশসহস্র মোগল সৈন্যের উপর পতিত হইয়া সমুদয় সৈন্য শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রাণ লইয়া আকবর গুজরাটাভিমুখে পলায়ন করিলেন। মোয়াজ্জম দক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া রাজপুতনায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কাঁকরলীর গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিলেই তাঁহাকে রসদশূন্য হইয়া মরিতে হইবে। মোয়াজ্জাম ভাল সেনাপতি ছিলেন, এইজন্য আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া সেই স্থলেই রাজপুতের হস্তে কিছু কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন নিয়তি প্রেরিত হইয়া ঔরঙ্গজেব মহারাণার ছদ্মবেশী চরের পরামর্শে নয়ন গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিলেন। উক্ত গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিয়া সম্রাট দেখিলেন, প্রবেশ ও নির্গমের উভয় পথই মহারাণার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। প্রবেশকালে ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় বিভাগের সহিত প্রথম বিভাগের বিচ্ছেদ ঘটায় সম্রাট বেগমের মধ্যে উদীপরী ও জেব-উন্নিসা ও রত্নাদি ও রসদ মহারাণার হস্তগত হইল। মহা-

রাণা এই সকল উদয়পুরে প্রেরণ করিয়া ঔরঙ্গজেব-দমনে নিযুক্ত হইলেন। এই গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ সম্রাট সৈন্য রাজপুতগণের শিলা ও গোলাবর্ষণের প্রভাবে দলে দলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া নয়ন-গিরিসঙ্কটকে থার্ম্মাপলিতে পরিণত করিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় এবং দারুণ পিপাসায় সম্রাট সসৈন্যে মহাযাতনা পাইয়া অগত্যা মহারাণার নিকট পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক মহারাণা প্রদত্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সসৈন্যে জীবন ভিক্ষা করিলেন। এদিকে উদীপুরীও রূপনগরের রাজ-দুহিতার পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য হইয়া গর্ব্বের খর্ব্বতা লাভ করিলেন এবং মহারাণার সৌজন্যে জেবউন্নিসা সহ সম্রাটসকাশে পুনঃপ্রেরিত হইলেন। আজম-শাহ ও অন্য একটি গিরিসঙ্কটে বিলক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

গিরিসঙ্কট হইতে বহির্গত হইয়া সম্রাট আবার উদয়পুর-আক্রমণ-প্রয়াসী হইয়া আজামের সৈন্যসহ মিলিত হইলেন; কিন্তু রূপনগর-রাজ বিক্রম সিংহ সসৈন্যে রাজসিংহের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া আজামের সৈন্য বিনাশ করিতে লাগি-লেন। শাহজাদা আজামকে পরাভূত করিয়া বিক্রম সিংহ মহারাণার করে যথাবিধি নিজ দুহিতা চঞ্চল কুমারীকে অর্পণ করিয়া নিজ জীবন সার্থক করিলেন।

এইবার ঔরঙ্গজেব রূপনগরের রাজকুমারীর আশায় বঞ্চিত হইয়া ভীষণ বেগে পুনরায় রাজসিংহকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু মহারাণা বিখ্যাত মারবারী বীর দুর্গাদাসের সৈন্য সহ মিলিত হইয়া পুনরায় সম্রাটকে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে সম্রাটের বহু লোকক্ষয় হইল; তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব রাজপুতগণ লুণ্ঠন করিয়া লইল। পিতা পুত্রে তখন সম্রাট চিতোরে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু সেখানেও সুবলদাস নামক রাজকর্ম্মচারী সম্রাটের রসদের পথ বন্ধ করায়, দিল্লীশ্বর আজমিরে পলায়ন করিয়া চঞ্চলকুমারীর আশা জন্মের মত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সুবলদাস আজামের সেনাপতি খাঁ রহিলাকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, উদয়-পুরের শতক্রোশের মধ্যে একটিও মোগল আর রহিল না। যশোবন্ত-মহিষী পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়া রাণার সাহায্য করিলেন; ইহাতে উপচিত বল হইয়া রাণা ক্রমে সমুদায় রাজপুতানা হইতে মোগলগণকে বিতাড়িত করিলেন। রাণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহের শরণাগত হইলে ভীমসিংহ অগত্যা গুজরাটে হিন্দুরাজত্ব স্থাপনে ক্ষান্ত হইলেন।

রাজমন্ত্রী দয়াল সাহা কিন্তু ছাড়িবার ছাত্র নহেন। তিনি জয়সিংহের সৈন্যের সহিত নিজ সৈন্য মিলাইয়া শাহজাদা আজামের সৈন্য নাশ করিতে লাগিলেন; চিতোরের নিকট আজাম একবারে হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। চারিবৎসর ধরিয়া এইরূপ যুদ্ধ করিয়া সম্রাট পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া, অগত্যা প্রকৃতই সন্ধি করিলেন। রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। সম্রাটের ধারণা হইল, আকবর রাজপুতের সহায় হইতে গিয়া পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। মোয়াজ্জাম প্রাণ ভরিয়া যুদ্ধ করেন নাই; এই জন্য তাঁহার এই লাঞ্ছনা পাইতে হইল। যাহা হউক রাজপুত শাসন করিতে আসিয়া সম্রাট্ বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়া রাজপুতকেশরী রাজসিংহের বিক্রমের নিকট পরাভব মানিলেন। মহারাণা প্রতাপের পর মোগল এরূপ শিক্ষা আর কাহারও নিকট কখনও পায় নাই। অগত্যা জিজিয়া, যশোবন্তের পুত্রদ্বয় এবং চঞ্চলকুমারী —এই কয়টির আশাই সম্রাটকে ত্যাগ করিতে হইল।

বিংশ লহরী।

পিতা-পুত্রে।

পলায়মান আকবর শুনিলেন, তাঁহার পিতার সন্দেহ হইয়াছে যে, তিনি রাজপুতগণের সহায়তায় স্বাধীন ভাবে আপনাকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; ইহা জানিতে পারিয়া সম্রাট তাঁহার নামীয় এক জালপত্র রাজপুতগণের হস্তে ফেলিয়া দেন; তাহাতে যেন সম্রাট আকবরকে লিখিতেছেন, "তিনি যেন রাজপুতগণের সহিত বাহ্যিক মিল করিয়া তাহাদের ভিতরকার সংবাদ সংগ্রহ করেন। কেহ বলে, সেই পত্র রাজসিংহের হস্তে পড়ায় তিনি আকবরকে সন্দেহ করিয়া বহু রাজপুত সৈন্য সহ আকবরকে আক্রমণ করিয়া হটাইয়া দিয়াছেন।" আকবর পিতার নিকট এইরূপে অবিশ্বাসী হইয়াছেন শুনিয়া এবং পিতার সহিত দেখা হইলে তাহার অনিবার্য্য ফল কারাদণ্ড বুঝিয়া গুর্জ্জর দিয়া সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত হইয়া জাহাজ যোগে মক্কাযাত্রা করেন; পরে পথে নানা বিপদের পর পারস্য-রাজের শরণ লাভ করেন। পারস্য রাজ তাঁহাকে অতি সমাদরে নিজ রাজ্যেই স্থান দান করেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্রাট আর আকবরের সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই।

উদয়-পুরের যুদ্ধের পর আকবর গুর্জ্জরের দিকে পলায়মান হইলে সম্রাট যুবরাজ মোয়াজ্জামকে আকবরের পশ্চাৎ প্রেরণ করেন। মোয়াজ্জাম উপযুক্ত সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে আকবর কথনই শিবাজী পুত্র শম্ভোজীর আশ্রয় পাইতেন না; এবং পরে বগনানার গিরিসঙ্কট অবলম্বনে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া দুইটি জাহাজ ভাড়া করিতে পারিতেন না, এবং আকবরের জাহাজ মস্কটের ইমামের অধিকারের সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মগ্ন হইলে, যখন ইমাম সাহেব আকবরের উদ্ধার করেন, তখন মোয়াজ্জাম উপযুক্ত দূত সহ ইমামের নিকট জাহাজ প্রেরণ করিলে, ইমাম নিশ্চয়ই সেই জাহাজেই আকবরকে বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে পারিতেন। তিনি কথনই পারস্যরাজের নিকট আকবরকে প্রেরণ করিতেন না এবং মস্কটে জাহাজ প্রেরণ না করিলেও মোয়াজ্জাম যদি পারস্যরাজের নিকট দূত পাঠাইতেন, তাহা হইলে পারস্যরাজও আকবরকে বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতেন। তাহা না হইয়া আকবর পারস্যরাজের নিকট গিয়া ধর্ম্মে

দীক্ষিত হইয়া, খোরাসানের শাসনকর্ত্তারূপে সসম্মানে কাল কাটাইতে পারিতেন না। এই সকল ব্যাপার কেবল মোয়াজ্জামের গাফিলতিতে ঘটিয়াছে; সম্রাটের ইহা দৃঢ় ধারণা হইল। এই জন্য মোয়াজ্জামের উপর সম্রাটের সন্দেহ বাড়িল।

এখন কেবলমাত্র আজমই সম্রাটের প্রিয়পাত্র রহিলেন, কিন্তু তাঁহার গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য তহবর খাঁ এবং ফিরোজ জঙ্গ নামক সেনাপতিদ্বয়কে সম্রাট নিয়োগ করিলেন। রাজপুতানার কার্য্য শেষ হইলে ১৬৮৩ খৃঃ সমুদায় মোগল সৈন্য একত্রিত করিয়া মহারাষ্ট্র দমনে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শম্ভোজী হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপনকারী— শিবাজীর পুত্র; দ্বিতীয়তঃ শম্ভোজী এতদিন ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ তিনি সম্রাটের "বিদ্রোহী" পুত্র আকবরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; চতুর্থতঃ শম্ভোজী আকবরের প্রতি সম্রাটপুত্রের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করায় অগত্যা আকবর, শম্ভোজীকে ত্যাগ করিয়া আওরাঙ্গাবাদে পলায়ন করেন। যদি শম্ভোজী আকবরকে আট-কাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে মোয়াজ্জাম আসিয়া অনায়াসেই আকবরকে হস্ত-গত করিয়া সম্রাটের করে সমর্পণ করিতে পারিতেন; এই সকল অপরাধে সম্রাট্ শম্ভোজী ও মারাঠাজাতিকে শাসন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। তখন ঔরঙ্গজেব নিজ বাহিনী, আজাম ও মোয়াজ্জামের সৈন্যের সহ মিলিত করিয়া মহারাষ্ট্র আক্রমণ করিলেন।

একবিংশ লহরী

মহারাষ্ট্র দমনে।

এইবার সম্রাট সাবধান হইলেন, যেন রাজপুতানার বিরোধের ন্যায় মহারাষ্ট্র বিরোধ তাঁহার শতচেষ্টা ব্যর্থ না করে। সম্রাট বরহানপুরে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্র বিজয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তিনি মোয়াজ্জামকে মহারাষ্ট্রের পশ্চিম-দিকে ও আজামকে পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়া মহারাষ্ট্রের গ্রাম নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন। মারাঠাগণ নিজ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া খাদ্যাদি লইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের আশ্রয় লইল। মোয়াজ্জাম সমুদায় কঙ্কনপ্রদেশ ধ্বংস করিয়াও একটী মারাঠা বা একটী পশুর মুখ দেখিতে পাইলেন না। খাদ্যাভাবে তাঁহার অশ্বগণ মরিতে লাগিল; সৈন্যসকলও রসদের অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িল। অশ্বারোহিগণ পদাতির ন্যায় পদব্রজে অনাহারে অবসন্ন দেহে বহু কষ্টে ফিরিতে লাগিল। তখন মোয়াজ্জাম সমুদ্রতীরে গিয়া খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি-লেন; কিন্তু পথে মারাঠাগণ ঘাস কাটিয়া লইয়াছিল, গ্রামসকল হইতে রসদ তুলিয়া লইয়াছিল, গবাদিকে পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এ অবস্থায় যদিও মোয়াজ্জাম সমুদ্রতীরে আসিলেন, কিন্তু মারাঠাগণ শস্যের জাহাজসকল লুঠ করিয়া লইল। খাদ্যাভাবে মোয়াজ্জামের সৈন্য দলে দলে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দুর্গম পার্ব্বত্যপথ, পার্ব্বত্য নদী, দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ, পর্ব্বতগাত্রে লুক্কায়িত মারাঠাগণের প্রস্তর ও বর্ষানিক্ষেপ, খাদ্যাভাব, অস্বাস্থ্য জলবায়ু এতগুলি বাধা অতিক্রম করিয়া মোয়াজ্জামের বিপুলবাহিনীর অল্পসংখ্যক সেনাই সম্রাটের নিকট ফিরিয়া আসিল। ঔরঙ্গজেব মোয়াজ্জামকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে শত্রুবধে পাঠাইয়াছিলাম, পাথর ভাঙ্গিতে বা উপবাস করিতে পাঠাই নাই। পাহাড়ের সহিত যুদ্ধ বিফল।" বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান রাজদ্বয় মারাঠাগণের চৌথ যোগাইতেছে, এই ধারণা হওয়ায় তখন অগত্যা ঔরঙ্গ-জেব উভয় ভ্রাতাকে বিজাপুর আক্রমণে নিয়োগ করিলেন। সম্রাট নিজে গোল-কুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই দুই রাজাই মুসলমান। মারাঠার সহিত যুদ্ধে লাভ কিছুই নাই; তাহাদের একটিও সৈন্য যুদ্ধে মারা যায় না; তাহাদের খাদ্যেরও অভাব হয় না; তাহারা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয় না; তাহাদের দেশ ধ্বংস করি-

সেও মারাঠাগণ শীঘ্রই পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করে; তাহারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার গ্রামগুলি লুণ্ঠন ও গ্রামবাসীদের নিকট চৌথ লইয়া নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। এস্থলে মারাঠাগণকে পেটে মারিবার জন্য সম্রাট অগ্রেই উক্ত দুইটী মুসলমান রাজ্যধ্বংসে মনোনিবেশ করিলেন।

এ দিকে মোয়াজ্জামের সৈন্য কঙ্কন ছাড়িয়া আসিবামাত্র শম্ভোজী তাঁহার দুর্দ্দম অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মোয়াজ্জামের সৈন্যের পার্শ্বদেশ দিয়া খান্দেশ লুণ্ঠন করিয়া সম্রাটের পূর্ব্ব-বাসস্থান বরহাণপুর লুণ্ঠন করিলেন। শম্ভোজী সেই সহরে আগুন লাগাইয়া দিলেন। তৎপরে মুসলমানের সৈন্যের রসদ নাশ করিবার জন্য সমুদায় প্রদেশে অগ্নি জ্বালিয়া দিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তখন মোগল সৈন্য গোলকুণ্ডার পথে অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং শম্ভোজী অবাধে মোগলাধিকৃত দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এই সংবাদে ঔরঙ্গজেব একদল মোগল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা আসিয়া দগ্ধনগরী ও প্রস্তরস্তূপ ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার যেমনি তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, অমনি শম্ভোজী পর্ব্বতাশ্রয় হইতে বহির্গত হইয়া মোগল সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাহারা রসদ অভাবে কষ্ট পাইয়া বহু কষ্টে সম্রাটের সহিত পুনর্মিলিত হইল। এ দিকে শম্ভোজী সমুদায় প্রদেশ নিজাধিকারে আনিয়া শাসন করিতে লাগিলেন। মারাঠাদিগের রণকৌশল এইরূপ জম্বুকলীলাময়।

ঐরূপ বিপুল-বাহিনীর সহিত ক্ষুদ্র মারাঠা সৈন্য সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হইলে মারাঠা সৈন্যের একান্ত বিলোপ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, মারাঠাগণ এইরূপ চাতুর্য্য অবলম্বনে ঔরঙ্গজেব সৈন্যের ধীরে ধীরে বিলোপসাধন করিয়াছিল। বিংশ বর্ষব্যাপী এই মহাসমরে মারাঠাগণ এই নীতি অবলম্বনে মোগলাধিকৃত নগরগুলি ব্যতীত সমুদায় প্রদেশ নিজাধিকারে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং সম্রাটের মারাঠাদমন কেবল মোগল দমনে পরিণত হইয়াছিল। কখনও কখনও মোগলগণ পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া মারাঠাধিকৃত পর্ব্বতপ্রদেশ আক্রমণ করিত, তখন মারাঠাগণ যদি দেখিত যে, আক্রমণকারী সৈন্যাপেক্ষা তাহাদের সৈন্যসংখ্যা বেশী, তখনই কেবল মারাঠাগণ শত্রুকে বেষ্টন করিয়া তিন দিক হইতে আক্রমণ করিত, এবং পর্ব্বতের দিক হইতে শত্রুর উপর ক্রমাগত প্রস্তর ও বর্শা নিক্ষেপ করিয়া শত্রুকে ব্যস্ত রাখিয়া অলক্ষিতে পার্শ্বদেশ দিয়া বেষ্টন দ্বারা সমূলে নির্ম্মূল করিত। কখনও বা প্রবল মোগল অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মুখে মারাঠা অশ্বারোহিদল

পলায়নের ভাণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া, লুক্কায়িত মারাঠা বন্দুকধারী সৈন্যকর্ত্তৃক দলেদলে বিনাশ করিতেন। এইরূপ প্রায় অদৃশ্য শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধ করা আর বায়ু বা জলের উপর অস্ত্রাঘাত একই কথা; ঔরঙ্গজেব বিলক্ষণ বুঝিয়া অগত্যা গোলককুণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজাপুর ও আহাম্মদনগরে মোগল সৈন্য সমরকেন্দ্র স্থাপন করিলে তথা হইতে বহির্গত হইয়া মহারাষ্ট্র দেশ উৎসন্ন করা মোগলের পক্ষে সহজ হইবে—সম্রাট্‌ ইহাই বুঝিলেন। আর বুঝিলেন, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর দমনই মহারাষ্ট্র দমনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

দ্বাবিংশ লহরী

বিজয়পুর-বিজয়ে।

বিজয়পুররাজ দেখিলেন, ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর সহিত বেশীদিন সম্মুখ-সংগ্রাম করিতে পারিবেন না। এইজন্য রাজা দুর্গের বহির্ভাগস্থ প্রজাবৃন্দকে শস্যাদি-সহ বিজয়পুর দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া বিজয়পুরের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গ্রামসকল ধ্বংস করিয়াছিলেন। যখন মোগলেরা আসিয়া বিজয়পুর অবরোধ করিল, তখন তাহারা রসদাভাবে মরিতে লাগিল। দুর্গের উচ্চপ্রাচীর হইতে বিজয়পুরের সৈন্যবৃন্দ মোগলবাহিনীর উপর অবিরাম কামান দাগিয়া, এবং গুপ্তপথে নিশাযোগে বাহির হইয়া মোগলদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বড়ই বিপন্ন ও ছত্রভঙ্গ করিতে লাগিল। এইরূপ দুই বৎসর লড়িয়া আজাম ও মোয়াজ্জাম বিজয়পুরের কোনই ক্ষতি করিতে পারিলেন না। মোয়াজ্জাম ঔরঙ্গজেবকে এই সংবাদ প্রদান করায়, ঔরঙ্গজেব সেনাপতি ফিরোজজঙ্গকে লিখিলেন—"আমি দেখিতেছি যুবরাজ মোয়াজ্জাম রাজপুতগণের উপর জয়লাভ করিতে পারেন নাই। মোয়াজ্জামকে কঙ্কনপ্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলাম; সেইখানে মোয়াজ্জাম কেবল সৈন্য নষ্ট করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আবার আকবরের বিপক্ষেও সেইরূপ নিষ্ফলতা দেখাইয়াছেন। এখন বিজয়পুরের সমরেও মোয়াজ্জাম কেবল লোকক্ষয় করিতেছেন; এরূপস্থলে মোয়াজ্জামকর্ত্তৃক হিন্দুর কোনও ক্ষতি হইবে না; হিন্দুর সহিত মোয়াজ্জামের যেন নিকট সম্বন্ধ এই ভাবই দেখা যাইতেছে। মোয়াজ্জামের জননী ও পত্নী ক্ষত্রিয়া। মানব মাতুলবংশেরই অনুসরণ করিয়া থাকে শুনা যায়; সুতরাং মোয়াজ্জাম থাকিতে একা আজাম যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বোধ হয় না। এজন্য তোমার উপর গোলকুণ্ডা বিজয়ের ভার দিয়া আমি বিজয়পুর বিজয়ে নিযুক্ত হইলাম। আমি বিজয়পুর ধ্বংস করিয়া যতদিন না ফিরি, তুমি অতি সাবধানে গোলকুণ্ডা অবরোধ করিবে। ছলে, বলে, কৌশলে শত্রুর মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ বাধাইয়া, একপক্ষকে হস্তগত করিয়া অন্য পক্ষকে শাসন করিতে প্রাণপণ করিবে। গোলকুণ্ডা নগরের দুর্গ প্রবেশের কোনও গুপ্তপথ আছে আমি শুনিয়াছি; ইতিমধ্যে কৌশলে ও অর্থব্যয়ে সেই পথের সন্ধান করিয়া

রাখিবে। যেন কর্ত্তব্যসাধনে কিছুমাত্র অবহেলা বা সতর্কতার অভাব না হয়। আমি সত্বরেই ফিরিব, সাবধান, সাবধান।"

তৎপরে পাছে আবার ফিরোজজঙ্গ শত্রুর সহিত মিলিয়া যান, এই আশঙ্কায় বীরবর তহবর খাঁকে বলিয়া গেলেন, "ফিরোজজঙ্গের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পার গোলকুণ্ডা দখল করা চাই। খুব হুসিয়ার। ভার তোমার উপর। তবে তুমি যে কর্ত্তারূপ রহিলে কোনও প্রকারে ফিরোজজঙ্গকে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে দিও না। প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিও, তবে ফিরোজের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিও, যেন তোমাকে ঠকাইয়া শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিয়া তোমার কর্ত্তৃত্বের প্রতিহিংসা সাধন না করে।" এইরূপে উভয়কে উভয়ের বিপক্ষে নিয়োগ করিয়া ঔরঙ্গজেব বিজয়পুরে আসিলেন। তিনি আসিয়াই বিজয়পুরের চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া পরিখা মধ্যে মোগল সৈন্য গোপনে রাখিলেন এবং নিকটবর্ত্তী চারিদিকের গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিয়া ধ্বংস করিলেন;—যাহাতে বিজয়পুরবাসী কোনও গুপ্ত-দ্বার দিয়া গিয়া গুপ্তপথে শস্যসংগ্রহ করিতে না পারে। চারিদিকে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তন্মধ্যে বারুদ পুরিয়া দুর্গের প্রাচীর নষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়পুর-পতি প্রাচীরের ভিতর তিন সারি প্রাচীর গঠন করায় এবং প্রথম প্রাচীর ঘন মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত করায়, মেরামত অতিশয় শীঘ্র হইতে লাগিল এবং দুর্গের কোনও ক্ষতি হইল না।

ঔরঙ্গজেব তখন অন্য কৌশল করিলেন। পরিখার সম্মুখে অতি উচ্চ করিয়া মৃণ্ময় প্রাচীর উত্তোলন করিলেন। প্রাচীরের পশ্চাতে সামান্য মাত্র সৈন্য পরিখা মধ্যে রাখিয়া চারিদিকের গ্রাম এমন ভাবে লুঠ করিতে লাগিলেন যে, তত্রত্য প্রজাগণ ধনপ্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। ইহার ফলে দুর্গবাসিগণ আর গুপ্ত পথেও শস্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না। এইরূপে এক বৎসর কাল লতাপাতা, জীবজন্তু, এমন কি বৃদ্ধ ও শিশু পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিয়া, দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারী ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে পরাজয় স্বীকার করিল। তখন দুর্গদখল করিয়া ঔরঙ্গজেব বিজয়পুর নগর ধূলিসাৎ করিলেন। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় বিজয়পুর নগরী পেচক ও জম্বুকের নগরী হইল। বিজয়পুর রাজকে কারাবাস দিয়া, নরনারীকে ক্রীতদাস করিয়া, বিজয়পুরের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া, সম্রাট ঔরঙ্গজেব আবার গোলকুণ্ডার দিকে ফিরিলেন।

ত্রয়োবিংশ লহরী

গোলকুণ্ডা অবরোধ।

বিজয়পুর পতনের পর সম্রাট সত্বরেই গোলকুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন। আসিবার পূর্ব্বেই শুনিলেন, সম্রাটের অনুপস্থিতিতে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মোয়াজ্জাম গোলকুণ্ডার অবরোধে যোগদান করিয়া গোলকুণ্ডাপতি আবুলহোসে-নের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া—মোয়াজ্জাম দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের সহিত মিলিত হইয়া সম্রাটের বিপক্ষতাচরণ করিতে-ছেন, এই ধারণায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। মোয়াজ্জামের কারাদণ্ড দিয়া সম্রাট যোধপুরী বেগমের নিকট হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলিলেন, "গত চল্লিশ বৎসরের পরিশ্রম সব মাটী হইল। আর পারি না।" ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে শাহজাঁহার অধীনে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ঔরঙ্গজেব এই গোল-কুণ্ডার দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। তৎকালে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা এই তিনটি রাজ্য ঔরঙ্গজেব বশীভূত করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে গোলকুণ্ডা ধ্বংসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সম্রাট কুলবার্গার দিকে তীর্থ যাত্রার ভাণ করিয়া অগ্রসর হইলেন; কিন্তু গোলকুণ্ডাপতি আবুলহোসেন স্পষ্টই বুঝিয়া-ছিলেন যে, গোলকুণ্ডার পতনই সম্রাটের অভিপ্রেত। আবুলহোসেন তখন সন্ধির কথা উল্লেখ করিয়া অতি কাতর ভাবে সম্রাটের বশ্যতাসূচক পত্র লিখিয়া পাঠাই-লেন; কিন্তু সম্রাট ছাড়িবার পাত্র নহেন, কথায় না ভুলিয়া তিনি ক্রমে গোল-কুণ্ডার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আবুলহোসেনের চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার অশ্বা-রোহী সৈন্য দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া মোগল ইঞ্জিনিয়ারগণের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যও ক্রমাগত পরিখা মধ্যস্থ মোগল সৈন্যের উপর অবিরত গোলা ও বোমা বৃষ্টি করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দুর্গস্থ সৈন্যগণ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মোগল সৈন্তকে আক্রমণ করিতে লাগিল। দুর্গে খাদ্য ও গোলা বারুদের অভাব ছিল না। ঔরঙ্গজেব শত্রুর এই প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াও ধীরে ধীরে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুর্গপরিখা বুজাইয়া ফেলিবার জন্য মৃত্তিকাপূর্ণ থলিয়ার প্রথম থলিয়াটী সম্রাট্ স্বহস্তে শেলাই করিয়া দিলেন। মৃত্তিকা স্তূপের উপর প্রাচীর-ভঙ্গকারী বৃহৎ বৃহৎ কামান হইতে মোগলেরা নিরন্তর গোলা-

বর্ষণ করিয়া আক্রমণকারী দুর্গ-সৈন্যকে হটাইয়া দিতে লাগিল। গভীর রাত্রে সম্রাট স্বয়ং একদল বাছাই সৈন্য লইয়া দুর্গ-প্রাচীরে মই লাগাইলেন। অবরোধকারী সৈন্যের কতকাংশ দুর্গ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিবামাত্র, প্রহরী কুক্কুরসকল চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন দুর্গরক্ষিবৃন্দ আক্রমণকারিগণকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়া প্রাচীর হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিল এবং মই সকল নষ্ট করিয়া দিল। এদিকে আক্রমণকারী সৈন্য রসদাভাবে কষ্ট পাইতে লাগিল। কারণ মোগল শত্রু শম্ভোজী আসিয়া গোলকুণ্ডার সাহায্য জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের শস্য লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। মোগল সৈন্যের মধ্যে তখন মহামারী দেখা দিল। অন্নাভাবে ও পীড়ায় কাতর হইয়া বহু মোগলসৈন্য গোলকুণ্ডার সৈন্যদলে যোগ দান করিল। এই সময় বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মোগলদের কষ্টের পরিসীমা থাকিল না। তাহাদের পরিখা-সকল জলপূর্ণ হইল; মৃত্তিকাস্তূপ সকল মূষলধারে বর্ষণবশতঃ ধুইয়া গেল। অবসর বুঝিয়া দুর্গস্থ সৈন্য আবার মোগল সৈন্যকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়া বহু সৈন্য ক্ষয় করিল এবং অনেককে বন্দী করিল। এই সময় সন্ধির আশায় আবুলহোসেন বন্দিগণকে নিজ শস্যাগার ও রত্নাগার দেখাইয়া বলিলেন, "তোমা-দিগকে আমি দূতরূপে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতেছি; এই সমুদায় শস্য ও রত্ন সম্রাটকে আমি প্রদান করিতে প্রস্তুত। তিনি অবরোধ ত্যাগ করুন। বৃথা লোক-ক্ষয় কি প্রয়োজন? মোগলসৈন্য এই অজেয় দুর্গ দখল করিতে পারিবে না।" দূতগণ সম্রাট্ সমীপে আবুলহোসেনের প্রস্তাব নিবেদন করিলে, সম্রাট্ বলিলেন,—"আবুল হোসেন যদি জোড়হস্তে আমার নিকট প্রাণভিক্ষা করে অথবা বন্দীদশায় আমার নিকট আনীত হয়, তখন আমি তাহাকে কিরূপ দয়া করিব, বুঝিয়া বলিব।" তৎক্ষণাৎ সম্রাট গোলকুণ্ডার পরিখা বুজাইবার জন্য পঞ্চাশ হাজার মৃত্তিকা পূর্ণ থলিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

কামান, বারুদ ও গোলায় যাহা হয় নাই, উৎকোচে তাহা সিদ্ধ হইল। ঔরঙ্গজেবের অর্থলোভে বশীভূত হইয়া বন্দী মোগলদের কেহ কেহ সম্রাটের দূত-রূপে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবুলহোসেনের বিশ্বাসভাজন হইয়া দুর্গদ্বারের রক্ষিরূপে নিযুক্ত হইল। তাহারা এক গভীর রজনীতে নিঃশব্দে দুর্গদ্বার খুলিয়া রাখিল। তখন মোগলসৈন্য মুক্ত দ্বার দিয়া নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দুর্গস্থ সৈন্যকে আক্রমণ করিল। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় দুর্গবাসিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার অবসর পাইল না; যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থানেই বীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে দেহ ত্যাগ করিতে লাগিল। আবুলহোসেনের বিশ্বস্ত

অনুচর আব্দররজক তখন একটি অশ্বের খালি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বারজন মাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া মোগলসৈন্য ভেদ করিয়া দুর্গের বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরদিন তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি নারিকেল বৃক্ষের তলদেশে মোগলেরা পাইল। তাঁহার দেহে সত্তরটি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন ছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বীর বরকে চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য দান করিয়া নিজ সৈন্যের সেনাপতিত্বে বরণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু আব্দররজক বলিলেন "আবুল হোসেনের যে ব্যক্তি লবণ খাইয়াছে, সে আর অন্যের চাকরী গ্রহণ করিতে পারে না।" তবে সম্রাট রজকের পুত্রদ্বয়কে উচ্চপদ প্রদান করিলেন।

এদিকে গোলকুণ্ডাপতি আক্রমণের ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বেগমগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলেন। পরে দরবার গৃহে অবিচলিত চিত্তে উপবেশন করিয়া প্রতিপক্ষের প্রবেশাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া বেলা হইয়াছে। আবুল হোসেন ধীর ভাবে বাবুর্চিকে নিজ প্রাতরাশ আনয়ন করিতে হুকুম দিলেন। অবিচলিত ভাবে আহার সমাপন করিয়া মোগল সেনাপতিকে দরবার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সেনাপতি আসিলে বিশুদ্ধ পারস্যভাষায় সেনাপতির সহিত সদালাপ করিয়া নিজ অশ্ব আনিবার হুকুম দিয়া, সেনাপতির সহিত গল্প করিতে করিতে শাহজাদা আজামের নিকট অশ্বারোহণে গমন করিলেন। আজাম সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্রাটের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সম্রাট তাঁহার সহিত রাজোচিত সম্মানের ব্যবহার করিয়া দুই চারি দিন পরে মহাসমারোহে দৌলতাবাদে প্রেরণ করিলেন। তথায় বিজয়পুরপতির সহিত আবুলহোসেন একত্রে বন্দীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। গোলকুণ্ডার ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া সম্রাট সত্তর লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে গোলকুণ্ডার ধ্বংস হইল। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার ধ্বংসে উভয়রাজ্যের সৈন্যবৃন্দ মারাঠা দলে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে লুঠপাঠ করিতে লাগিল। ইহাতে শম্ভোজীর ক্ষতি না হইয়া বরং দুই রাজ্য অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার অবাধ লুণ্ঠনের আরও সুবিধা হইল। এই উভয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ অনেকটা স্বাধীন হইয়া মারাঠাদের সাহায্য করিতে লাগিল।

চতুর্বিংশ লহরী



শম্ভোজী-প্রয়াণে।

বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংস করিলে শম্ভোজীর শাসন অনায়াসেই ঘটিবে, সম্রাটের এই আশা বৃথা হইল দেখিয়া তিনি প্রবল বেগে পুনরায় মারাঠা দমনে নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট মহীশূরের সীমানা পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ অধিকৃত করিয়া শিবাজীর ভ্রাতাকে তাঞ্জোরে অবরোধ করিলেন। মারাঠাগণকে সমতল ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট তাহাদিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। এদিকে শম্ভোজী একদিন একদল মোগল সৈন্যের উপর বিজয়লাভ করিয়া এক নিভৃত পর্ব্বত গুহার সম্মুখস্থ লতামণ্ডপে একজন মাত্র বয়স্যের সহিত বিজয়োৎসবের পানাধিক্যের অসতর্ক অবস্থায় অন্য একজন মোগল সৈনিকের দ্বারা ধৃত হইয়া, সম্রাট সমীপে নীত হয়েন। সম্রাট শম্ভোজীর পিতৃ উচ্চারণ করায় এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার দাসত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করায়, নির্ভীক শম্ভোজী ঔরঙ্গজেবকে অপমানসূচক পরুষ বাক্যে উত্তর দান করেন, তাঁহার অঙ্গে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করেন, ও পদাঘাত করিতে উদ্যত হয়েন। ইহাতে সম্রাটের আদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই শম্ভোজীর জিহ্বা ও হস্তপদাদি একে একে কর্ত্তন করা হয়, তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করা হয়, এবং টুকরা টুকরা করিয়া তাঁহার মাংস কর্ত্তন করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হয়, পরে তাঁহার অনুচরেরও সেই শাস্তি বিধান করা হয়।

এই লোমহর্ষণ নৃশংস ব্যবহারের কথা শুনিয়া সমুদায় মারাঠা জাতি ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া সম্রাটের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক মিনিটের জন্য সম্রাটকে বিশ্রাম লাভ করিতে দেয় নাই; বরং নিরন্তর বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়াছিল। অপর দিকে জাঠ জাতি আগরার চারিদিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল, এবং কাবুল হইতে প্রেরিত খাজনা লুঠ করিল। ইহাতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দিলেন, কোনও হিন্দু পাল্কী চড়িতে পাইবে না, অথবা আরবদেশীয় ঘোটকে আরোহণ করিবে না। মারাঠাগণ তখন মোগল রাজ্যে এত লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়াছিল যে, সম্রাট আজামকে একদিকে, ও অন্যদিকে ফিরোজজঙ্গকে মারাঠা দমনে প্রেরণ করিলেন। অগত্যা জাঠ-শাসন জন্য সম্রাট মোয়াজ্জামকে কারামুক্ত করিয়া

সেইকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যোধপুরী বেগমের মৃত্যু ঘটায় সম্রাট মাতৃহীন মোয়াজ্জামের প্রতি সদয় হয়েন এবং সেনাপতির অভাবে তাঁহাকেই জাঠ দমনে প্রেরণ করেন। এদিকে আজাম মারাঠা শাসনে সফল না হওয়ায় তিনি সম্রাটের সন্দেহভাজন হইলেন। পিতার পত্র পাইলেই আজামের মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত; ভয় হইত আবার কি বিপদে পড়িতে হইবে। অবশেষে উদীপুরী বেগমের পুত্র কামবকস্‌ই সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইলেন। কিছুদিন পরে মারাঠার পক্ষপাতী বলিয়া সন্দেহ হওয়ায়, তাঁহাকেও সম্রাট কারাদণ্ড প্রদান করেন; তবে তাঁহার প্রিয় বেগম উদিপুরীর অনুরোধে সত্বরেই কারামুক্ত করেন। এই সময়ে বিন্ধ্যাচলের উত্তরে জাঠগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল; রাজপুতগণ পুনরায় বিরোধী হইল; শিখগণ মুলতানে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিল; বঙ্গদেশেও অশান্তি দেখা দিল। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে মারাঠাগণ সর্ব্বত্রই গ্রামাদি লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিয়া সমুদয় দাক্ষিণাত্য মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা প্রকাশ্যভাবে সম্রাটের সৈন্যবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে লাগিল; এমন কি সম্রাটকে পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সম্রাটের ভাণ্ডার শূন্য হইল; সৈন্যদের বেতন বাকী পড়িতে লাগিল; মোগল সৈন্য অর্থাভাবে ও খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল ও সাহসহীন হইল। সম্রাটও অতিবৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া আহম্মদনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় পুত্রগণকে একে একে দূরে প্রেরণ করিলেন, পাছে তাহারাও তাঁহাকে শাহজাঁহার দশায় ফেলে। পুত্রগণ নিকটে আসিতে চাহিলেও তিনি আসিতে দিলেন না।

পঞ্চবিংশ লহরী।

বিপদে অন্তিমে।

এই সময়ে মারাঠাগণ ভীমানদীর উপত্যকায় সবিশেষ সফলতা লাভ করিল। মোগল সেনাপতি তহবর খাঁ যুদ্ধে আহত ও পরাজিত হইলেন। সম্রাট স্বয়ং প্রবল মারাঠাবাহিনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আল্লার হস্তেই সমুদায় শক্তি ; মানবের হস্তে কিছুই নাই।" শাহজাদা কামবক্স্ কর্ণাটের যুদ্ধে কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি সেনাপতি জুলফিকার খাঁর সহিত কলহ করিলেন। এমন সময় মারাঠাগণ কামবক্স্‌কে অবরোধ করিল। বহু কষ্টে জুলফিকার তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া তাঁহাকে বইরামপুরীতে সম্রাটের নিকট দিয়া আসিলেন। সম্রাট শুনিলেন, গোয়াতে পর্ত্তুগীজগণ ও বোম্বাইয়ে ইংরাজগণ নিজ নিজ রাজার নামে মুদ্রা বাহির করিয়াছে ; ইহাতে সম্রাট তাহাদের শাসন করিলেন। এ দিকে মারাঠা সেনাপতি শান্তাজী সম্রাটের একটি সৈন্যকে পরাভূত ও অন্য একটি সৈন্যকে প্রায় নির্ম্মূল করিলেন। হস্তী ও মালপত্র দখল করিয়া লইলেন। এ দিকে মোয়াজ্জামকে মুক্তিদান করায় আজাম মহা ক্রুদ্ধ হইলেন। এজন্য সম্রাট তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ভীমার বন্যায় সম্রাটের শিবির, আসবাব, অশ্ব, গবাদি, ও প্রায় দ্বাদশসহস্র সৈন্য ভাসিয়া গেল। এই সময়ে একজন মোগল সেনাপতি মারাঠা হস্তে বন্দী হইলেন।

৯৬৩১। এই সকল বিপদে পড়িয়া সম্রাট মারাঠাগণের বিপক্ষে জেহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন ; এবং প্রত্যেক মুসলমানকে হিন্দুর বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন এক বিপুল মুসলমান বাহিনী সাতারা অবরোধ করিল। শান্তাজী তখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আজামকে কাবুল হইতে আনিয়া সম্রাট এই অবরোধের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। শম্ভোজীর ভ্রাতা মারাঠা রাজধানী সাতারা ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইলেন। অবরোধ শেষ না হইতেই তিনি কালকবলে পতিত হইলেন। সাতারার দুর্গ প্রাচীর বারুদ দ্বারা উড়াইয়া দিয়া মোগল সম্রাট স্বয়ং সাতারা দখল করিলেন। সাতারার শাসনকর্ত্তার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট তাঁহাকে একজন সেনাপতি করিলেন।

তৎপরেই আজাম পারণীয় দুর্গ অধিকার করিলেন। এই সকল বিজয়দর্শন করিয়া আজামের উপর সম্রাটের আবার সন্দেহ হইল। তাহাকে তিনি উজ্জয়িনীর বিজয়ে প্রেরণ করিলেন।

তখন উজ্জয়িনীর বিধবা রাজমহিষী তারাবাই মারাঠার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আজামের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্তা হইলেন। আজাম দুর্গসকল দখল করিলেই তারাবাই অমনি প্রচণ্ড বিক্রমে সেই সকল দুর্গ পুনরধিকার করিয়া লইতে লাগিলেন। একদল মারাঠা সৈন্যকে আজাম যেমন ছত্রভঙ্গ করিলেন, তারাবাই অমনি সেই সৈন্যদলকে পুনর্গঠিন করিয়া লইলেন। এইরূপে তারাবাই সমুদায় দাক্ষিণাত্য বারম্বার লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত মারাঠাগণের সহিত নিষ্ফল সমর করিয়া ক্লান্ত দেহে সম্রাট আহম্মদনগরে ফিরিলেন। তথায় তাঁহার বারম্বার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আজাম পিতাকে বারম্বার পত্র লিখিয়া তাঁহার শ্রীচরণদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আজাম সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্রাট কামবক্সকে লিখিলেন "জীবনের জীবন, বৎস, শুন, এই সংসারে ক্ষণস্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়া মানব কেবল দুঃখই অর্জ্জন করে। আমি আমার সাম্রাজ্যের প্রকৃত রক্ষক হইতে পারি নাই। আমার বহু মূল্য সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে। আমি একাকী আসিয়াছিলাম এবং একাকীই নিজ পাপের বোঝা লইয়া চলিলাম। যে দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সেই দিকে সেই সর্ব্বশক্তিমানকেই দর্শন করিতেছি। আমি বহু পাপ করিয়াছি। জানি না তজ্জন্য আমাকে কি ভয়ানক যাতনা পাইতে হইবে। আমার সাম্রাজ্যের রক্ষকতা পরমেশ্বর আমার পুত্রগণের উপর অর্পণ করিয়াছেন।" পরে তিনি আজামকে লিখিলেন "আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, আমার জীবনতরী অজ্ঞাত অর্ণব জলে ভাসাইয়াছি। এখন বিদায়—বিদায়—বিদায়।"

এই সময় আকবর বিদেশে স্বর্গারোহণ করিলেন। মোয়াজ্জাম তখন কাবুলে। কামবক্সকে সম্রাট গতিক বুঝিয়া বিজয়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। আজামকে দূরে রাখিবার জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে মালব দেশে পাঠাইলেন। অবশেষে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্বাবসানে বিশ্ববিজয়ী আলমগীর বাদশাহ প্রাতঃকালীন নমাজ যথাবিধি সমাপন করিয়া প্রশান্তভাবে মালা ধরিয়া আল্লানাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৯০

চান্দ্র বৎসর সতের দিন হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বাদেশ মত তাঁহাকে দৌলতাবাদে মুসলমান পীরগণের পার্শ্বেই বিনা আড়ম্বরে সমাহিত করা হইল। "আমার যে কোনও পুত্র সৌভাগ্যক্রমে আমার তক্ত তাউস পাইবে। সেই উত্তরাধিকারী রূপে আমার সাম্রাজ্যের রক্ষক হইবে।" ইহাই তাঁহার উইলে লেখা ছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল—ভ্রাতৃবিরোধ। তাহা মোগল সিংহাসন আরোহণের মামুলি ব্যবস্থা। এবারও তাহাই ঘটিল।

সমাপ্ত